স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

মৎস্য কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

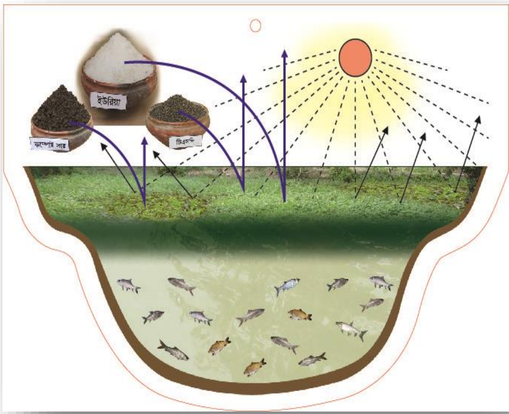

সেপ্টেম্বর - ২০২০

এলজিইডি, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সূচিপত্র

অধিবেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধিবেশন-১	মৎস্য বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা পদ্ধতি	১
	১.১ মৎস্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য (Objectives of the Fisheries Program)	১
	১.২ উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন (Mitigation of Adverse Impacts)	১
	১.৩ উপ-প্রকল্প মৎস্য খাতর সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল	২
	১.৪ মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Fisheries Sector Development Plan)	২
	১.৫ মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় ঃ	২
	১.৬ মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ঃ	২
	১.৭ মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত কৌশল (নির্দেশিকা) ঃ	৩
	১.৮ উপপ্রকল্পে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল	৫
	১.৯ পোনা সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা	১৩
	১.১০ মৎস্য খাত নেতিবাচক প্রভাব পরিকল্পনা	১৪
	১.১১ মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচি ভিত্তিক দারিদ্র হ্রাসকরণের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৪
	১.১২ নারী সদস্যদের উন্নয়নে মৎস্য কর্মসূচী	১৬
	১.১৩ বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল (নির্দেশিকা)	১৭
	১.১৪ বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	১৮
	১.১৫ মৎস্য আবাস ও উৎপাদন হ্রাস	২৪
	১.১৬ সমন্বিত কৃষি ও মৎস্যচাষ	২৪
	১.১৭ মৎস্য-বান্ধব অবকাঠামো তৈরী ও পরিচালনা	২৫
	১.১৮ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মৎস্য বিষয়ক কর্মসূচির বিবরণ	২৫
	১.১৯ মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার সুযোগ ও আয় হ্রাস	২৮
	১.২০ পাবসসের মাধ্যমে টেকসই মাত্রায় মৎস্য উৎপাদন	২৯
অধিবেশন-২	মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল	৩১
	২.১ কার্যক্রম	৩১
	২.২ মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল	৩৫
অধিবেশন-৩	মৎস্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের ও বিএফআরআই'র সম্ভাব্য ভূমিকা	৩৭
	৩.১ মৎস্য অধিদপ্তর	৩৭
	৩.২ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)	৩৮
অধিবেশন-৪	মৎস্য উৎপাদন প্রযুক্তিতে স্মার্ট একুয়াকালচার এবং পুকুরে কার্প (রুই) জাতীয় মাছের চাষ	৩৯
	৪.১ স্মার্ট এ্যাকুয়াকালচার	৩৯
	৪.২ পুকুরে কার্প জাতীয় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়	৩৯
অধিবেশন-৫	কার্প নার্সারী ব্যবস্থাপনা	৪৯
	৫.১ স্থান নির্বাচন	৪৯
	৫.২ ব্যবস্থাপনা	৫০
অধিবেশন-৬	তেলাপিয়া মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	৫৯
	৬.১ ভূমিকা	৫৯
	৬.২ অর্থনৈতিক গুরুত	৫৯

অধিবেশন-৭	গুলশা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	৬৫-৭৮
অধিবেশন-৮	শিং মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	৭৯
	৮.১ শিং মাছ চাষের সুবিধা ও গুরুত্ব	৭৯
	৮.২ শিং মাছ চাষ পদ্ধতি	৮০
	৮.৩ পুকুর নির্বাচন	৮০
	৮.৪ শিং মাছ চাষের মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা	৮১
	৮.৫ মজুদ কালীন ব্যবস্থাপনা	৮২
	৮.৬ পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন	৮২
	৮.৭ পোনা অবমুক্তকরণ	৮২
	৮.৮ মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	৮৩
	৮.৯ শিং মাছের পুকুরের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	৮৫
	৮.১০ মাছের রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা	৮৬
	৮.১১ মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	৮৭
	৮.১২ শিং মাছ চাষের লাভ ক্ষতি বিশ্লেষণ	৮৭
অধিবেশন-৯	মাছ চাষে কিছু সমস্যা ও প্রতিকার	৮৯
অধিবেশন-১০	গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা	৯১
	১০.১ ভূমিকা	৯১
	১০.২ গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি	৯২
	১০.৩ গলদা চিংড়ি চাষের জন্য স্থান নির্বাচন	৯৩
	১০.৪ পুকুর প্রস্তুতি	৯৪
	১০.৫ পি এল মজুদ	১০০
	১০.৬ খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১০৪
	১০.৭ চাষকালীন ব্যবস্থাপনা	১০৮
	১০.৮ আহরণ, আহরণোত্তোর পরিচর্যা, গ্রেডিং, বাজারজাতকরণ এবং রেকর্ড সংরক্ষণ	১০৯
	১০.৯ রেকর্ড সংরক্ষণ	১১৩
	১০.১০ গলদা চিংড়ির সাধারন রোগ, প্রতিকার এবং প্রতিরোধ	১১৪
	১০.১১ গলদা চিংড়ি চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১১৬
অধিবেশন-১১	গলদা চিংড়ির নার্সারী কার্যক্রম	১১৮
অধিবেশন-১২	বায়োফ্লক প্রযুক্তি	১২৫
	১২.১ বায়োফ্লক মৎস্য চাষে সম্ভাবনার নবদিগন্ত	১২৫
	১২.২ বায়োফ্লক কী? (What is Biofloc?)	১২৫
	১২.৩ ইতিহাস (History of Biofloc Technology)	১২৭
	১২.৪ বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষের সুবিধা (Advantages of Biofloc Technology)	১২৭
	১২.৫ বায়োফ্লক প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Biofloc Technology)	১২৮
	১২.৬ বায়োফ্লক অ্যাকোয়াকালচার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management of biofloc aquaculture)	১২৮
	১২.৭ কাঙ্খিত কার্বন -নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা (Maintaining Desired Carbon-Nitrogen Ratio)	১২৯
	১২.৮ বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।	১২৯
অধিবেশন-১৩	উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (গুড একুয়াকালচার প্রাক্টিস- জিএপি)	১৩১
	১৩.১ উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন	১৩১
	১৩.২ উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (জিএপি) অনুসরন কেন প্রয়োজন	১৩১

অধিবেশন-১৪	প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা	১৩৯
	১৪.১ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ..	১৩৯
	১৪.২ প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন হ্রাসের কারণ..	১৪০
	১৪.৩ প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ	১৪০
	১৪.৪ প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সম্ভাবনা	১৪১
	১৪.৫ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো	১৪২
	১৪.৬ প্রাকৃতিক মাছ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ	১৪৫
	১৪.৭ মাছ চাষ কার্যক্রম	১৪৬
অধিবেশন-১৫	মৎস্য খাতে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন..	১৪৯
	১৫.১ ভূমিকা	১৪৯
	১৫.২ ছক পূরণ করার অনুসরনিকা, ছক -৫	১৪৯
	পরিশিষ্ট-ক মৎস্য অধিদপ্তর ও এলজিইডি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক..	১৫৩
	পরিশিষ্ট-খ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এলজিইডি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক	১৫৭
	পরিশিষ্ট-গ মাপের একক ও এর রুপান্তর	১৬০

অধিবেশন-১

মৎস্য বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা পদ্ধতি

পানি মাছের আবাস এবং মাছ পানির ফসল। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৎস্য আবাস, উৎপাদন এবং উৎপাদনকারীদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। পক্ষান্তরে উপ-প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণযোগ্য জলাশয়ে মাছ চাষের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই মৎস্য খাত পানি ব্যবস্থাপনার নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যই প্রকল্পের মৎস্য বিষয়ক কর্মসূচি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন অনেক উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য উৎপাদনের উপযুক্ত জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। এসব জলাশয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারকল্পে সুপরিকল্পিত ভাবে মৎস্য উৎপাদন করার জন্য বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার।

১.১ মৎস্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য (Objectives of the Fisheries Program) ঃ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মৎস্য বিষয়ক কর্মসূচির উদ্দেশ্য মূলতঃ দুইটি ঃ

উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন ও পাবসসের মাধ্যমে টেকসই মাত্রায় মৎস্য উৎপাদন

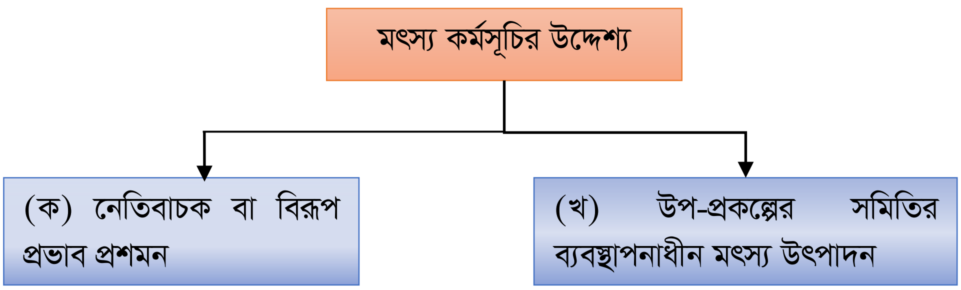

এই প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য হল প্রভাব প্রশমনের পাশাপাশি টেকসই মাত্রায় মৎস্য উৎপাদনে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান।

১.২ উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন (Mitigation of Adverse Impacts) ঃ

উপ-প্রকল্পের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা মূলক কার্যক্রমের ফলে মৎস্য খাত প্রধানত: দুই ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ঃ

- মৎস্য আবাস ও উৎপাদন হ্রাস।
- মৎস্য জীবিদের মাছ ধরার সুযোগ এবং আয় হ্রাস।

এছাড়া উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৎস্য জীব বৈচিত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

১.৩ উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

ভূমিকা

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রই হল উপ-প্রকল্প সমূহ। তাই উপ-প্রকল্প ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নই প্রকল্পের মৎস্য কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

১.৪ মৎস্য খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা (Fisheries Development Plan) ঃ

উপ-প্রকল্পে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমের প্রধান ও প্রথম কাজ হবে মৎস্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। একটি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর পরই এ পরিকল্পনা তৈরী করা দরকার। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল (ক) পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মৎস্য খাতের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা প্রশমনকল্পে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (খ) উপ-প্রকল্পে বিদ্যমান মৎস্য উৎপাদন সহায়ক সম্পদ সমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরন।

উপ-প্রকল্পে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মৎস্য উৎপাদনযোগ্য জলাশয়, মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা, মৎস্য উৎপাদনের পরিমান তথা মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার সুযোগ ও আয় প্রভাবিত হতে পারে। যার ফলে এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই পরিবর্তিত অবস্থায় যে সব সম্ভাব্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া দ্বারা উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সাধন তথা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তা-ই মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যক্রম। এ প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে ঃ

১.৫ মৎস্য খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় ঃ

কোন উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে নিম্নরূপ ঃ

- উপ-প্রকল্পে বিদ্যমান অবস্থায় পাবসসের নিয়ন্ত্রণে জলা ব্যবহারের সম্ভাব্যতা।
- উপ-প্রকল্পে বিদ্যমান জলা ও মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের সম্ভাব্যতা।
- উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনায় উক্ত উপ-প্রকল্পের মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম অর্থাৎ “বিরূপ প্রভাব প্রশমন” এবং “সম্ভাব্য মাত্রায় মৎস্য উৎপাদন” এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা।

১.৬ মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ঃ

ক) মৎস্য খাত জরীপ

খ) মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই

গ) মৎস্য খাতে উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

ঘ) মৎস্য খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

১.৭ মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত কৌশল (নির্দেশিকা) ঃ

প্রথমেই মৎস্য খাতের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি মৎস্য উপ-কমিটি গঠন করতে হবে (ছক-১)। তারপর নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ক) মৎস্য খাত জরীপ (ছক-২) ঃ

মৎস্য খাত জরীপ করে নিম্নলিখিত বিষয় নিরূপণ করতে হবে ঃ

- মৎস্য উৎপাদনযোগী জলা জরীপ এবং উহাতে প্রকল্প অবকাঠামো উন্নয়নের প্রভাব।
- পাবসসের ব্যবস্থাপনায় মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য জলাশয়ের পরিমান নির্ধারণ।
- বিদ্যমান মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের পরিমান নিরূপণ।
- মৎস্য উৎপাদনকারীদের পেশাগত অবস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ।
- মৎস্য উৎপাদনে সহায়ক সরবরাহ ও সহায়তার ব্যবস্থাদির বিবরণ।

খ) মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই ঃ

উপ-প্রকল্পে বিদ্যমান মৎস্য উৎপাদন যোগ্য জলাশয়ের পরিমান এবং এতে মৎস্য উৎপাদন সম্ভাবনা নির্ধারণ প্রথম ধাপের কাজ। অনেক উপ-প্রকল্পে কোন কোন জলাশয় মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও তা কোন বিশেষ কারণে মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যেমন- কোন কোন প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদন উপযোগী চমৎকার জলাশয় আছে কিন্তু উহা ব্যক্তি মালিকানায় হওয়ায় তাতে পাবসস এর ব্যবস্থাপনাধীনে মৎস্য উৎপাদন সম্ভব নয়। এ ছাড়া বিদ্যমান বা ব্যবহার যোগ্য জলার পরিমান অল্প হলেও লাভজনকভাবে মৎস্য উৎপাদন সম্ভব নাও হতে পারে।

তাই কোন উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উক্ত উপ-প্রকল্পের মৎস্য উৎপাদন সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করা দরকার। বিদ্যমান অবস্থায় মৎস্য উৎপাদন লাভজনক না হলেও সম্ভাব্য উন্নয়ন সাধনের ফলে যদি মৎস্য উৎপাদন লাভজনক বলে বিবেচিত হয় তাহলে উক্ত উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা করা দরকার।

গ) মৎস্য খাত উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরন ঃ

- মৎস্য উৎপাদনের জন্য জলাশয় উন্নয়ন
- মৎস্য উৎপাদনকারীদের উন্নয়ন
- উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়ন
- উৎপাদন সহায়ক সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- মৎস্য আহরণ ও বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়ন

ঘ) মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি ঃ

পাবসসের প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং মৎস্য উপ-কমিটি উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করবেন। এ কাজে পরামর্শ ও সহযোগীতা দেবেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা মৎস্য অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার (প্রয়োজনমত), মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর, সিপিও, সিএস, কমিউনিটি অর্গানাইজার ও কমিউনিটি এসিসট্যান্ট।

মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রথমে পরিকল্পনা তৈরী সম্পর্কে পাবসস কর্তৃপক্ষ উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর এর সাথে আলোচনা করে বিষয়টি ভাল করে বুঝে নিবেন।

(২) এবার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ডেকে সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা করে মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবেন।

(৩) তারপর মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর ও জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত জরীপ করে লাভজনক মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে হবে। (কোন উপ-প্রকল্পের কমপক্ষে মৎস্য উৎপাদনযোগ্য ২০ হেঃ মৌসুমী জলাশয় অথবা ১০ হেঃ বছরী জলাশয় থাকলে তা লাভজনক মৎস্য উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে)।

(৪) এ পর্যায়ে উপ-প্রকল্পে মৎস্য খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

(৫) চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে সম্ভাব্য উন্নয়ন ব্যবস্থা ও কৌশল নির্ধারণ করে একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

(৬) এই খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি এক দিনের কর্মশালা বা ওয়ার্কশপে আলোচনা করতে হবে। এই ওয়ার্কশপে উপ-প্রকল্পের সদস্যগণ বিশেষ করে মৎস্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত সদস্যগণ যোগ দেবেন। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট সরকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণও ওয়ার্কশপে উপস্থিত থাকবেন। এই ওয়ার্কশপে উন্নয়ন পরিকল্পনার খুটিনাটি বিষয়াদি আলোনা করে চূড়ান্ত করতে হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করার জন্য নমুনা ছক-৩ অনুসরণ করা যেতে পারে।

মৎস্য উন্নয়ন ক্ষেত্র ও উন্নয়ন কার্যক্রম (উদাহরণ) ঃ

উন্নয়নের ক্ষেত্র	উন্নয়ন কার্যক্রম (উদাহরণ)
❖ মৎস্য জলাশয়	❖ বাঁধ উন্নয়ন, ক্ষতিকর উদ্ভিদ অপসারণ ❖ জলাশয় লীজ গ্রহণ
❖ মৎস্য উৎপাদনকারী	❖ প্রশিক্ষণ প্রদান ❖ ঋণ গ্রহণে সহায়তা
❖ মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি	❖ প্রাকৃতিক ❖ মজুদ ভিত্তিক ❖ চাষ ভিত্তিক
❖ উৎপাদন সহায়ক সরবরাহ ও ব্যবস্থা	❖ পোনা উৎপাদন ❖ বালাই ব্যবস্থাপনা ❖ কারিগরি সহায়তা দান
❖ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা	❖ পাহারা ব্যবস্থা উন্নয়ন ❖ দক্ষ মৎস্য কর্মী নিয়োগ ❖ বড় সাইজের পোনা মজুদ
❖ আহরণ ও বিপনন ব্যবস্থা	❖ অবিরাম আহরণ ❖ ছোট / বড় মাছ আহরণ ❖ উৎপাদন স্থলে বা দূরের বাজারে বিপনন

(৭) উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরী সহায়তা দেবেন স্থানীয় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর। অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা দিবেন সিপিও, সিএস, কমিউনিটি অর্গানাইজার ও কমিউনিটি এসিসট্যান্ট।

১.৮ উপ-প্রকল্পে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

কোন উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে এর মৎস্য উন্নয়ন সম্ভাব্যতা নির্ধারিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য রেকর্ড করা হবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপ-প্রকল্প জলাশয় মৎস্য উৎপাদনের জন্য বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

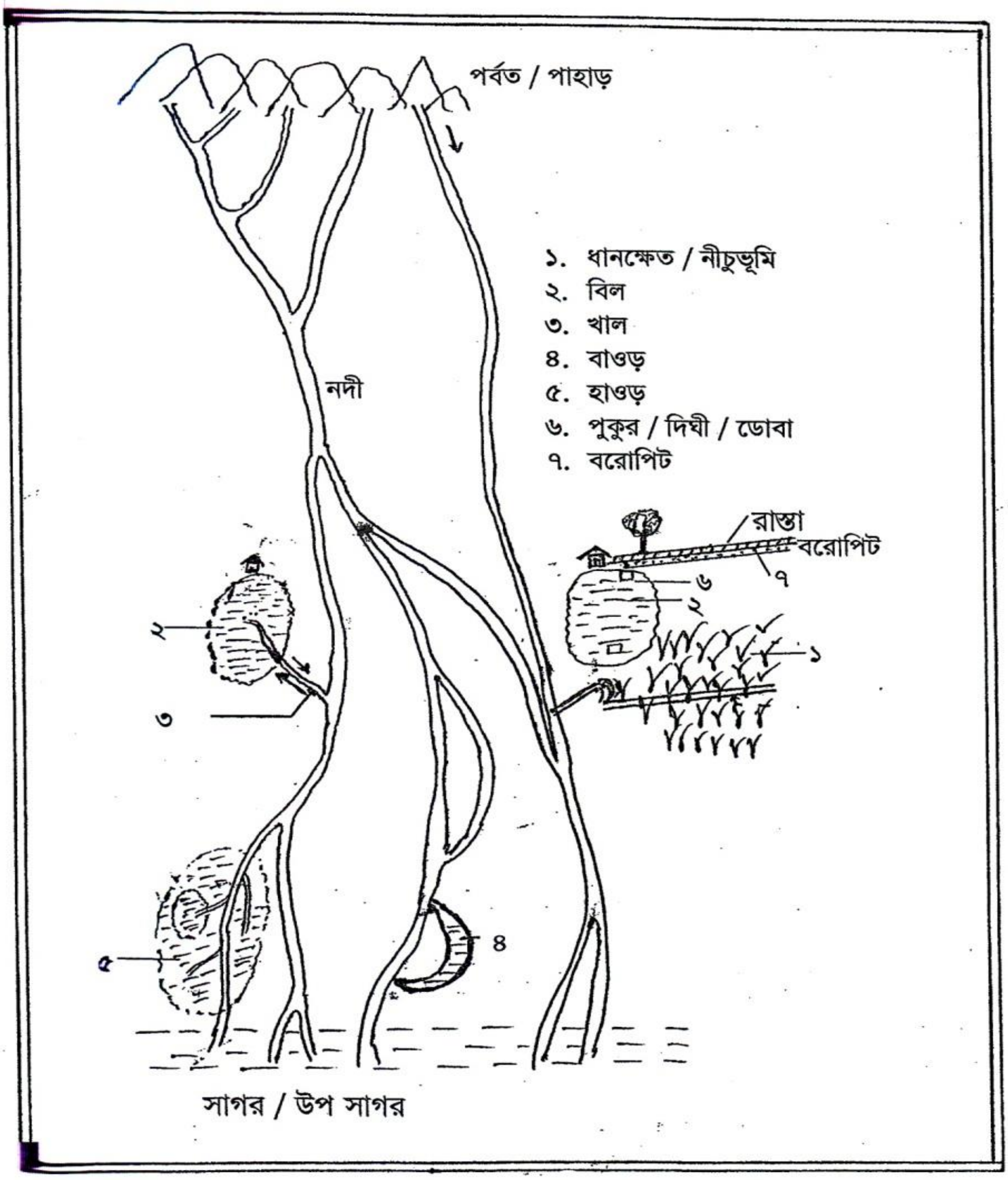

জলাশয় পরিচিতি

সংযোজনী: উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত সম্পর্কিত তথ্য ছক (ছক-১)

মৎস্য উপ-কমিটি গঠন ঃ

উপ-প্রকল্প:

উপজেলা :

জেলা :

ক) পাবসস প্রতিনিধি

১। .... গ্রাম।

২। .... গ্রাম।

খ) গ্রাম প্রতিনিধি

১। .... গ্রাম।

২। .... গ্রাম।

৩। .... গ্রাম।

৪। .... গ্রাম।

৫। .... গ্রাম।

৬। .... গ্রাম।

৭। .... গ্রাম।

৮। .... গ্রাম।

৯। .... গ্রাম।

১০। .... গ্রাম।

১১। .... গ্রাম।

১২। .... গ্রাম।

১৩। .... গ্রাম।

১৪। .... গ্রাম।

১৫। .... গ্রাম।

গ)
- ❖ আহবায়ক......................................
- ❖ সচিব...

- ➢ প্রথমে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে ২ জন প্রতিনিধি নিতে হবে।
- ➢ উক্ত প্রতিনিধিদ্বয় যে দুই গ্রামের নিবাসি সেই গ্রাম দুইটি বাদ দিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার অন্য সকল গ্রাম থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে হবে।
- ➢ তারপর সকল সদস্যদের মধ্য থেকে একজন আহ্বায়ক এবং একজন সচিব নির্বাচন করতে হবে।

সংযোজনী: উপ-প্রকল্পের মৎস্য খাত জরীপ ছক (ছক-২)

উপ-প্রকল্প ঃ উপজেলা ঃ জেলা ঃ

ক. মৎস্য জলা ও উৎপাদনের বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	জলাভূমি/ জলাশয়	মোট আয়তন (হেঃ)	বর্তমান উৎপাদন (টন/বছরে)			খাস জমির বিবরণ			
			প্রাকৃতিক উৎপাদন	চাষ ভিত্তিক	মোট	আয়তন (হেঃ)	বর্তমান লীজ গ্রহীতা	লীজ মেয়াদ	লিজ মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ধান ক্ষেত/নীচু ভূমি								
২	বিল								
৩	খাল								
৪	বাওড়								
৫	হাওড়								
৬	পুকুর, দীঘি, ডোবা								
৭	বরোপিট								
মোট									

মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি: ক) প্রাকৃতিক উৎপাদন ঃ বিনা ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক জলা থেকে আহরিত মৎস্য।

খ) চাষ ভিত্তিক উৎপাদন ঃ চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন।

গ) মৎস্য উৎপাদনকারী, মৎস্য শ্রমিক ও মৎস্য ব্যবসায়ী।

শ্রেণী (মৎস্য উৎপাদনকারীর ধরণ)	সংখ্যা			গড় বার্ষিক আয়	অন্য পেশা	মন্তব্য
	পুরুষ	নারী	মোট			
প্রকৃত মৎস্যজীবি (Full Time Fishers)						
খন্ডকালীন মৎস্যজীবি (Part Time Fishers)						
প্রকৃত মৎস্যচাষী (Full Time Fish Farmers)						
খন্ডকালীন মৎস্যচাষী (Part time Fish Farmers)						

খ) মৎস্য উৎপাদনকারী ঃ যিনি উৎপাদিত মাছের মালিক এবং মাছের বিক্রয় লব্দ টাকা পান। মৎস্যজীবি ও মৎস্য চাষীগণ মৎস্য উৎপাদনকারী।

মৎস্য শ্রমিক ঃ যিনি মাছ ধরা, চাষ বা অন্যবিধ মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রমে শ্রম দেবার জন্য চুক্তি অনুযায়ী মজুরী হিসেবে অর্থ বা ধৃত মাছের অংশ পান।

মৎস্য ব্যবসায়ী ঃ মৎস্য খাতের ব্যবসা ভিত্তিক কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ। মাছ ক্রয়-বিক্রয়, মৎস্য সরঞ্জাম, সার, খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত ব্যবসায়ীগণ।

প্রকৃত মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী ঃ জীবিকা নির্বাহের জন্য শুধু মাছ ধরা/মৎস্য চাষই যাদের একমাত্র পেশা এবং যাদের কার্য সময়ের অধিকাংশই মাছ ধরা/ মৎস্য চাষের কাজে ব্যয় হয়।

খন্ডকালীন মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী ঃ যারা বছরের আংশিক সময় মাছ ধরা/ চাষ পেশায় নিয়োজিত হন অথবা একই সময় মাছ ধরা/ চাষ ছাড়াও অন্য পেশায় নিয়োজিত হন।

গ) মৎস্য উৎপাদন সহায়ক সরবরাহ ও সহায়তার বিবরণ ঃ

গ.১ বিদ্যমান মৎস্য রেনু পোনা সংগ্রহের উৎস ঃ

উৎস	সংগ্রহের পরিমাণ	
	রেনু (কেজি)	পোনা (১০০০)
মোট		
১। স্থানীয়		
২। বাহির		
ক) প্রাকৃতিক		
খ) হ্যাচারী উৎপাদিত		
i. সংগ্রহ (প্রাকৃতিক)		
ii. নিজস্ব উৎপাদিত		
iii কেনা		

গ.২ হ্যাচারী ও নার্সারী বিষয়ক তথ্য ঃ

১. উপ-প্রকল্প এলাকা ও উপজেলায় অবস্থিত হ্যাচারী (উপ-প্রকল্প থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত) ঃ

ক্রঃ নং	অবস্থান (গ্রাম)		মালিকানা (সরকারী/ ব্যক্তিগত)	উৎপাদন (কেজি/বছরে)								
	উপ-প্রকল্প	উপজেলা		০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	মোট
১)												
২)												
৩)												
৪)												

০১ = কাতল ০২ = রুই ০৩ = মৃগেল ০৪ = গ্লাস কার্প ০৫ = সিলভার কার্প ০৬ = কমন কার্প (১) ০৭ = কমন কার্প (২) = আইশমুক্ত ০৮ = ব্র্যাক কার্প ০৯ = বিগ হেড ১০ = পুটি ১১ = গলদা চিংড়ি ১২= ......

২.	উপ-প্রকল্প ও ইউনিয়নে অবস্থিত নার্সারী (উপ-প্রকল্প থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত) ঃ

ক্রঃ নং	অবস্থান (গ্রাম)		মালিকানা (সরকারী/ ব্যক্তিগত)	উৎপাদন (কেজি/বছরে)								
	উপ-প্রকল্প	উপজেলা		০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	মোট

গ.৩	মৎস্য উৎপাদনী তহবিল গঠনে সহায়তার ব্যবস্থা ঃ

ক্রমিক নং	সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান	সহায়তার ধরণ (ঋণ/মঞ্জুরী)	মন্তব্য
০১			
০২			
০৩			

গ.৪	কারিগরী / আপদকালীন সহায়তার ব্যবস্থা ঃ

ক্রমিক নং	সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান	খরচের পরিমান (যদি লাগে)	মন্তব্য
০১			
০২			
০৩			

গ.৫	মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের বিষয়
০১		
০২		

* পুকুরের মালিক একাধিক হলে একজনের নাম লিখে গং লিখবেন এবং বন্ধনীতে মোট মালিক সংখ্যা লিখবেন। সরকারী বা প্রতিষ্ঠানিক মালিকানা হলে তা উল্লেখ করুন।

** শুষ্ক মৌসুমে কমপক্ষে ২.৫ ফুট পর্যন্ত গভীর পানি এলাকা মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য বলে ধরা যায়। **ঘ.	উপ-প্রকল্পের প্রাকৃতিক মৎস্য ও চাষকৃত প্রজাতির তালিকা ঃ**

ক্রঃনং	মৎস্য প্রজাতির নাম		প্রাকৃতিক			চাষে ব্যবহৃত
	বাংলা নাম	ইংরেজী নাম/বৈজ্ঞানিক নাম	প্রচুর (+++)	অল্প (++)	খুব অল্প (+)	
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						

>২৪% = +++		৫-২৪% = ++		১-৪% = +

৬. উপ-প্রকল্পের মৎস্য উৎপাদনকারীদের বিবরণ (মৎস্য জলাশয়সহ) ঃ

ক্রঃনং	মৎস্য উৎপাদনকারীর নাম (মৎস্যজীবি/ মৎস্যচাষী)	মৎস্য পেশা	গ্রাম	সদস্য নং	মৎস্য উৎপাদনী জলাশয়		উৎপাদন (কেজি) বছরে				মন্তব্য (মৎস্য পেশা থেকে আয়)
					ধরণ	আয়তন (একর)	পোনা	বড় মাছ	চিংড়ি	মোট	
১.											
২.											
৩.											
৪.											
৫.											

* (ক) প্রকৃত মৎস্যজীবি (খ) খন্ডকালীন মৎস্যজীবি (গ) প্রকৃত মৎস্যচাষী (ঘ) খন্ডকালীন মৎস্যচাষী।

উপপ্রকল্প এলাকার মৎস্য সেক্টর ম্যাপ (নমুনা)

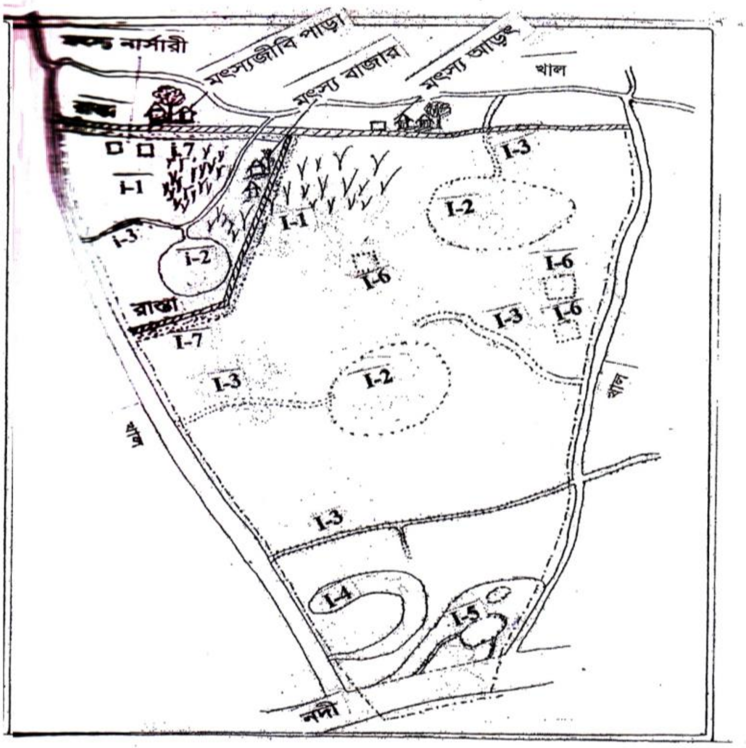

জলাশয়	সংখ্যা	আয়তন (একর)
১ ধানক্ষেত / নীচু জমি		
২ বিল		
৩ খাল		
৪ বাওড়		
৫ হাওড়		
পুকুর/দীঘি/ডোবা		
বরোপিট		
মোট=		

উপ-প্রকল্পে মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা (সামগ্রিক) (ছক-২) ঃ

১. উপ-প্রকল্প তথ্য

ক) উপ-প্রকল্প নম্বর, নাম ও ধরণ ঃ

খ) উপজেলা ঃ .... জেলা ঃ..

গ) উপকৃত এলাকা (হেঃ/একর)

ঘ) উপকারভোগী থানা সংখ্যা ঃ

ঙ) প্রস্তাবিত / সমাপিত অবকাঠামো

অ) বাঁধ তৈরী ঃ .... কিঃ মিঃ

আ) খাল খনন / পুনঃ খনন ঃ .... কি.মিঃ

ই) পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো ঃ

- ❖ রেগুলেটর (সংখ্যা ও কপাট সংখ্যা)
- ❖ স্লুইস (সংখ্যা ও কপাট সংখ্যা)
- ❖ কালভার্ট (সংখ্যা)
- ❖ ....

ঈ) মৎস্য র‌্যালী

উ) ....

চ) উপ-প্রকল্প এলাকার মৎস্য উৎপাদনী জলাশয়ের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন	প্রকল্পের প্রভাব (হ্যাঁ/না)	মালিকানা (সরকারী/ব্যক্তিগত, একক/ যৌথ, সদস্য/ অসদস্য)

**ছ)	মৎস্য খাত প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ**

ক)	পানি এলাকা ও গভীরতা হ্রাস (পরিমান)

খ)	মৎস্য প্রগমন (migration) বাধা প্রাপ্ত

গ)	মৎস্য উৎপাদন হ্রাস (পরিমান)

ঘ)	মৎস্য জীবিদের মাছ ধরার সুযোগ ও আয় হ্রাস

ঙ)	মৎস্য উৎপাদনী জলাশয় সৃষ্টি (পরিমান)

**২.	মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ**

**২.১	জলাশয় সংগঠন (পাবসস ব্যবস্থাপনাধীন জলাশয়)**

**২.১.১	খাস জলাশয় সংগঠন**

ক্রমিক নং	**খাস জলাশয়ের নাম/ধরণ**	**আয়তন (একক)**	**বর্তমান ইজারা ব্যবস্থা**	**পাবসস এর ইজারা গ্রহণের পদক্ষেপ**
০১				
০২				
০৩				
০৪				
০৫				
মোট =				

২.১.২ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানিক জলাশয় সংগঠন ঃ

ক্রমিক নং	**জলাশয়ের ধরণ**	**আয়তন (একক)**	**মালিকানা (ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানিক)**	**ইজারা বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ**
০১				
০২				
০৩				
০৪				
০৫				
মোট =				

২.১.৩ জলাশয়ের ভৌতিক উন্নয়ন ঃ

ক)	পাড় / বাঁধ মেরামত

খ)	মৎস্য চলাচল নিয়ন্ত্রণী জাল স্থাপন

গ)	আগাছা পরিস্কার করণ

৩. মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়ন ঃ

ক্রমিক নং	জলাশয়	আয়তন (একক)	বর্তমান মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি	পরিকল্পিত উন্নয়ন মৎস্য উন্নয়ন পদ্ধতি	মন্তব্য
০১					
০২					
০৩					
০৪					
০৫					

৪. মৎস্য উৎপাদনকারীদের পেশাগত উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১			
০২			
০৩			
০৪			
০৫			

৫. বিশেষ মৎস্য উৎপাদন প্রযুক্তির প্রদর্শনী খামার স্থাপন ঃ

নির্বাচিত মৎস্য উৎপাদন প্রযুক্তি	উদ্যোক্তা (পাবসস/সদস্য)	মন্তব্য
ক. কার্প নার্সারী		
খ. ধান ক্ষেতে মাছ চাষ		
গ. প্লাবনভূমি/ বিল মাছ		
ঘ. গলদা নার্সারী চাষ		
ঙ.		
চ.		

১.৯ পোনা সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঃ

১.৯.১ মৎস্য রেণু উৎপাদন / সরবরাহ পরিকল্পনা ঃ

ক্রঃ নং	প্রজাতি	সম্ভাব্য চাহিদা (কেজি)	বর্তমান স্থানীয় উৎপাদন (কেজি) ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে	বাড়তি উৎপাদন পরিকল্পনা		সংগ্রহ পরিকল্পনা
				পাবসস	অন্যান্য	
০১						
০২						
০৩						
০৪						
০৫						

১.৯.২ মৎস্য পোনা উৎপাদন / সংগ্রহ পরিকল্পনা ঃ

ক্রঃনং	মৎস্য প্রজাতি	সম্ভাব্য চাহিদা (কেজি/সংখ্যা)	বর্তমান স্থানীয় উৎপাদন (কেজি/সংখ্যা)	বাড়তি স্থানীয় উৎপাদন পরিকল্পনা		বাহির থেকে সংগ্রহ পরিকল্পনা	
				পাবসস	অন্যান্য	উৎস	পরিমান কেজি /সংখ্যা
০১							
০২							
০৩							
০৪							
০৫							
মোট=							

১.১০ মৎস্য খাতে নেতিবাচক প্রভাব পরিকল্পনা ঃ

নেতিবাচক প্রভাব	কারণ	প্রশমন পরিকল্পনা
মাছের উৎপাদন হ্রাস	(ক) মৎস্য আবাস সংকোচন	* মাছ ও ধান একত্রে উৎপাদনের জন্য জলাভূমির বিস্তৃতি, গভীরতা ও স্থায়ীত্ব সংরক্ষণ।
	(খ) প্রজননকারী মাছ ও পোনা মাছের প্রবেশ পথ হ্রাস	* মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো তৈরী ও পরিচালনা ব্যবস্থা।
মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার সুযোগ ও আয় হ্রাস	ক) প্রাকৃতিক জলাশয়ের মৎস্য চারণ ক্ষেত্র সংকোচন/বিলোপ	* পাবসস নিয়ন্ত্রিত মাছ উৎপাদন কার্যক্রমে মৎস্যজীবিদেরকে নিয়োগ দান।
		* মৎস্য সম্পর্কিত বিকল্প কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ দান।
	খ) উৎপাদন হ্রাস	* উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি।

১.১১ মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচি ভিত্তিক দারিদ্র হ্রাসকরণের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

ক) দরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ (উপ-প্রকল্পের প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের আওতায় খানা জরীপ করা হবে)।

খ) দরিদ্র জনগণকে মৎস্য উৎপাদনী খাস জলা ব্যবহারের সুযোগ দান।

গ) সম্ভাব্য মৎস্য পেশায় প্রশিক্ষণ দান।

ঘ) মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঋণের ব্যবস্থাকরণ।

দরিদ্র শ্রেণী	খানা সংখ্যা			সম্ভাব্য মৎস্য পেশা	সম্ভাব্য সহায়তা ব্যবস্থা
(০১) ভূমিহীন (০.৪৯ শতাংশ)	মোট	মৎস্য	ক্ষতিগ্রস্থ		
অ) বাস্তহারা (বসতি নাই, জমি নাই)				■ মৎস্য শ্রমিক ■ মৎস্য পোনা বিক্রয় ■ মৎস্য বিক্রয় ■ মৎস্য আহরণ ■ লীজকৃত পুকুরে মৎস্য পোনা উৎপাদন	❖ ছোট ধরনের আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান ❖ পাবসসের মৎস্য কর্মসূচিতে নিয়োগদান ❖ মৎস্যভিত্তিক আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমগ্রহণে সহায়তা দান
আ) প্রকৃত ভূমিহীন (বসতি আছে কিন্তু জমি নাই)				■ উপরে বর্ণিত পেশা ■ ছোট ছোট মাছ ধরার জাল ও সরঞ্জামাদি তৈরী	❖ উপরে বর্ণিত রূপ ❖ নার্সারী পরিচালনা ও ধান ক্ষেতে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণদান
ই) কার্যত ভূমিহীন (বসতি ও ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত জমি আছে)				■ উপরে বর্ণিত পেশা ■ নিজ পুকুরে নার্সারী স্থাপন ■ ধান ক্ষেতে মাছ চাষ	❖ নার্সারী ও মৎস্য চাষ বিষয় প্রশিক্ষণদান এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দান
(০২) প্রান্তিক চাষী (৫০-৯৯ শতক)				■ নিজ পুকুরে নার্সারী স্থাপন ■ ক্ষুদ্র পরিসরে মাছ চাষ	❖ নার্সারী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান
(৩) ক্ষুদ্র চাষী (১০০-২৪৯ শতক)				■ ব্যবসায় ভিত্তিক নার্সারী ও মৎস্য খামার স্থাপন	❖ নার্সারী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ❖ ব্যবসায় ভিত্তিক নার্সারী ও মৎস্য খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগীতা দান
(০৪) মাঝারী চাষী (২৫০-৭৮৯ শতক)				■ ব্যবসায় ভিত্তিক নার্সারী ও মৎস্য খামার স্থাপন	❖ নার্সারী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ❖ ব্যবসায় ভিত্তিক নার্সারী ও মৎস্য খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগীতা দান
(০৫) বড় চাষী (৭৫০ শতক বা তার চেয়ে বেশী জমির মালিক)				■ ব্যবসায় ভিত্তিক নার্সারী ও মৎস্য খামার স্থাপন	❖ নার্সারী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ❖ ব্যবসায় ভিত্তিক নার্সারী ও মৎস্য খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগীতা দান

১.১২ নারী সদস্যদের উন্নয়নে মৎস্য কর্মসূচি ঃ

ক) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি / নির্বাচন

খ) সম্ভাব্য মৎস্য পেশা নির্বাচন

গ) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তার ব্যবস্থাকরণ

ঘ) সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থাকরণ

ক্র. নং	ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যজীবির নাম	গ্রাম	সদস্য নং	প্রকল্প পূর্ব বার্ষিক আয় (টাকা)	ক্ষতিগ্রস্থ হবার কারণ		পূনর্বাসন ব্যবস্থা										
					মাছ ধরার সুযোগ হ্রাস	উৎপাদান হ্রাস	ক) ফ্রি ছাড়া পাবসস সদস্য	খ) এলসিএস কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তি	গ) পাবসস কর্তৃক ঋণ দান	ঘ) খাস জলাশয় ব্যবহারের অধিকার	ঙ) পাবসসের মৎস্য কর্মসূচিতে	চ) মৎস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণ	ছ) মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ছ-১) মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য	জ) অন্য আয়মূলক পেশায়	জ-১) অন্য আয়মূলক পেশায়	ঝ) অন্যান্য
০১																	
০২																	
০৩																	
০৪																	
০৫																	
০৬																	
০৭																	
০৮																	
০৯																	
১০																	
১১																	
১২																	

ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা (ছক)

১.১৩ বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল (নির্দেশিকা) ঃ

ক) পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরী করবেন এবং মৎস্য উপ-কমিটি বিশেষ সহায়তা দেবেন।

খ) পরিকল্পনা তৈরী সম্পর্কে পাবসস কর্তৃপক্ষ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সোসিও-ইকোনমিষ্ট ও মৎস্য ফ্যাসিলিটেটরদের সাথে আলোচনা করে ভালভাবে বুঝে নিবেন।

গ) জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য ফ্যাসিলিটেটরদের সহায়তায় উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষের সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে নিবেন। কোন উপ-প্রকল্প পাবসসের নিয়ন্ত্রণে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে ২০ হেঃ মৌসুমী জলাশয় অথবা ১০ হেঃ বছরী জলাশয় ব্যবহার করা সম্ভব হলে উহা মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ করার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা যাবে। তবে অবস্থা ভেদে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

ঘ) এ পর্যায় পাবসসের একটি সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

- মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে কিনা।
- মৎস্য উৎপাদন উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রাম থেকে ১/২ জন প্রতিনিধি এবং পাবসস নির্বাহী কমিটি থেকে ১/২ জন প্রতিনিধি নিয়ে মৎস্য কমিটি গঠন করা যাবে। এভাবে নির্বাচিত সদস্যদের একজন দলনেতা এবং একজন উপ-দলনেতা নিযুক্ত করতে হবে)।
- খাস জমি লীজ গ্রহণ (খাস জমির উৎপাদন সম্ভাবনা ও লীজ মূল্য বিবেচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে)।
- নির্বাচিত জলাভূমির অন্তর্গত ব্যক্তি মালিকানার জলাশয় ব্যবহারের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- মৎস্য উৎপাদনী কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে।
- তহবিল গঠন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করতে হবে।
- আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ) উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি খসড়া বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

চ) খসড়া বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনাটি একটি এক দিনের কর্মশালা বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করে সেখানে আলোচনা করতে হবে। এই ওয়ার্কশপে উপ-প্রকল্পের সদস্যগণ বিশেষ করে মৎস্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ যোগদান করবেন। এছাড়া উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা মৎস্য অফিসার, সোসিও ইকোনমিষ্ট, কমিউনিটি অর্গানাইজার ও মৎস্য ফ্যাসিলিটেটরগণ উপস্থিত থাকবেন। এই ওয়ার্কশপে উৎপাদন পরিকল্পনার খুটিনাটি বিষয়াদি আলোচনা করে চূড়ান্ত করতে হবে।

ছ) প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনায় উদ্বৃত করতে হবে।

জ) মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক কার্যক্রমের রেকর্ড রাখতে হবে।

১.১৪ বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

ক) উপ-প্রকল্পে মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচী পাবসস এর ব্যবস্থাপনায় মৎস্য উপ-কমিটির তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে।

খ) তিন ধরনের মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হতে পারে উপ-প্রকল্প এলাকায়।

- **পাবসসের প্রত্যক্ষ উৎপাদন কর্মসূচী ঃ** সম্পূর্ণ পাবসসের খরচে পাবসসের ব্যবস্থাপনাধীনে বাস্তবায়িত হবে।
- **পাবসস অনুমোদিত উৎপাদন কর্মসূচী ঃ** পাবসসের লীজকৃত জলাশয় পাবসসের অনুমতিক্রমে মৎস্য উৎপাদন।
- **সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ঃ** সদস্যগণ নিজস্ব উদ্যোগে মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে পারে।

এছাড়া অসদস্যগণের ব্যবস্থাপনাধীনেও উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হতে পারে।

গ) **পাবসসের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনাধীনে বাস্তবায়িত মৎস্য কর্মসূচী মৎস্য উপ-কমিটি প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচিত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। এ প্রেক্ষিতে কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ ঃ**

- **মৎস্য উৎপাদনী জলাশয়ের সংগঠন**
  - সরকারী জলাশয় লীজ গ্রহণ এবং রক্ষিত (বর্ষাকালে প্লাবিত) একীভূত জলাশয়ের অন্তর্গত ব্যক্তি মালিকানার জলাশয় ব্যবহার সম্পর্কিত ব্যবস্থাগ্রহণ।
  - এভাবে সংগঠিত জলাশয় মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনমত প্রস্তুতকরণ (যেমন পানি প্রয়োজনমত চলাচলের ব্যবস্থা করণ, বাঁধ মেরামত, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি)।

- **মৎস্য উৎপাদনে সম্ভাবনা / লক্ষ্যমাত্রা**

এ কাজে স্থানীয় মৎস্য অফিসারের সাহায্য নিয়ে নির্বাচিত জলাশয়ে কি পরিমান মৎস্য উৎপাদন করা যাবে- তা নির্ধারণ করা যাবে।

- **মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি**

মজুদ ভিত্তিক ও চাষ ভিত্তিক উৎপাদনের জন্য কোন পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদন করা যাবে- তা নির্ধারণ করতে হবে।

- **মৎস্য প্রজাতি নির্বাচন**

নির্বাচিত জলাশয়ে কোন ধরনের মৎস্য/চিংড়ি প্রজাতি চাষ করা যাবে বা হবে- তা নির্ধারণ করতে হবে।

- **মাছ চাষের মৌসুম**

জলাশয়ের স্থিতি (মৌসুমী/বছরী) বিবেচনা করে মাছ উৎপাদনের মৌসুম নির্ণয় করতে হবে।

- **মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও তদারকী**

মৎস্য উৎপাদন ও তদারকী কার্যক্রমের জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচী তৈরী করতে হবে। যেমন- কখন, কোথা থেকে কোন ধরনের, কি মাপের, কি পরিমান মৎস্য পোনা যোগাড় করে কোন পুকুরে ছাড়তে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। তাছাড়াও কে কিভাবে পাহারা দিবে, প্রয়োজনে খাবার দেবে, পানি ছেড়ে বা ধরে রাখবে, কখন কিভাবে মাছ ধরা হবে-তা নির্ধারণ করতে হবে।

- **প্রয়োজনীয় পোনার পরিমান নির্ধারণ**

নির্বাচিত জলাশয়ে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদনের জন্য কোন ধরনের, কি মাপের, কি পরিমান পোনা প্রয়োজন হবে- তা নির্ধারণ করতে হবে। এ কাজেও স্থানীয় মৎস্য অফিসার সহায়তা করবেন।

- **মৎস্য উৎপাদনে খরচের প্রাক্কলন**

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে বার্ষিক উৎপাদন খরচের প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে।

- **মৎস্য উৎপাদনের তহবিল গঠন**

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়নের পূর্বেই এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- **মৎস্য কর্মী নিয়োগ**

প্রয়োজনীয় সংখ্যক মৎস্য কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। উপ-প্রকল্পের অন্তর্গত ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যজীবি, গরীব জনগণকে এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- **মৎস্য উৎপাদনের সহায়ক সরবরাহ ও সহায়তা ব্যবস্থা**

মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মৎস্য পোনা সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় উৎপাদন ছাড়াও প্রয়োজনমত বাহ্যিক সংগ্রহের উৎস ঠিক করতে হবে।

- **রেকর্ড সংরক্ষণ**

কে, কখন, কিভাবে মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত কি কি বিষয় রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন- তা নির্ধারণ করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্য ছক

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

ক) বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন ও এই খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

উপ-প্রকল্পের নম্বর ও নাম ঃ	
উপজেলা	ঃ
জেলা	ঃ

খ) মৎস্য উপ-কমিটির বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	পাবসস / গ্রাম	মন্তব্য

গ) মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	নির্বাচিত মৎস্য শ্রেণী ও প্রজাতি[১]	উৎপাদন লক্ষ্য (পোনা, বড় মাছ)	জলার বিবরণ					উৎপাদন পদ্ধতি (প্রাকৃতিক/মজুদ ভিত্তিক চাষ)
			জলার ধরণ[২]	সংখ্যা	আয়তন (একর)	প্রভাবিত/ প্রভাবমুক্ত	সরকারী/বেসরকারী	

১. **মৎস্য শ্রেণী ও প্রজাতি:** ক) মৎস্য (রুই, কাতলা, মৃগেল, কমন কার্প, মিরর কার্প, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প ....) খ) চিংড়ি (গলদা, বাগদা)।

২. **জলার ধরণ :** ধান ক্ষেত/ নীচু জমি, বিল, খাল, বাওড়, হাওড়, পুকুর/দীঘি/ডোবা, বরোপিট।

ঘ) প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	সংখ্যা		
		পুরুষ	নারী	মোট

ঙ) প্রদর্শনী পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	প্রদর্শনীর ধরণ	সংখ্যা	উদ্যোক্তা

চ) দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য কর্মসূচির পরিকল্পনা ঃ

প্রশিক্ষনের বিবরণ		প্রশিক্ষনের বিবরণ			লোন প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ	
বিষয়	সংখ্যা	বিষয়	উদ্যোক্তা	জলার বিবরণ	সংখ্যা	ব্যবহার পরিকল্পনা

ছ) ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যজীবিদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	পুনর্বাসন বিবরণ *	মন্তব্য

* ক) ফি ছাড়া পাবসসের সদস্য ভূক্তিকরণ খ) এলসিএস কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত গ) পাবসস কর্তৃক ঋণ দান ঘ) খাস জলাশয় ব্যবহারের অধিকার দান ঙ) পাবসসের মৎস্য কর্মসূচিতে নিয়োগ দান চ) মৎস্য কমিটিতে অন্তর্ভূক্তকরণ ছ) মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান ছ-১) মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত জ) অন্য আয়বর্ধকমূলক পেশায় প্রশিক্ষণদান বা নির্বাচন জ-১) অন্য আয়বর্ধকমুলক পেশায় প্রশিক্ষণ দানের জন্য নির্বাচিত ঝ) অন্যান্য।

জ) নারী উন্নয়ন কর্মসূচি (মৎস্য কর্মসূচির আওতায়) ঃ

প্রশিক্ষনের বিবরণ		মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা		লোন প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ		

ঝ) পোনা উৎপাদন / সংগ্রহের বিবরণ ঃ

উৎপাদন পদ্ধতি/ সংগ্রহের উৎস	উৎপাদন/সংগ্রহের জন্য পরিকল্পিত প্রজাতি ভিত্তিক পোনার হিসাব								
A. উৎপাদন (স্থানীয়)	রুই	কাতলা							মোট
i. পাবসস									
ii. অন্যান্য									
মোট									
B. প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ									
C. অন্যান্য (বাহিরের উৎস থেকে সংগ্রহ)									
সর্বমোট									

ঞ) পাবসস নিয়ন্ত্রিত মৎস্য উৎপাদন খরচের প্রাক্কলন ঃ

ক্রমিক নং	খাত	খরচ (টাকা)	মন্তব্য
(ক)	মাছ বিক্রির টাকা পাওয়ার আগের খরচ		
০১	ইজারা খরচ		
(ক)	সরকারী জলমহাল ইজারা খরচ		
(খ)	অন্যান্য জলাশয় ইজারা খরচ		
০২	জলা প্রস্তুত খরচ		
(ক)	অবকাঠামো তৈরী/উন্নয়ন		
(খ)	কাদা/আগাছা/অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ		
(গ)	চুনা/সার প্রয়োগ		
০৩	পোনা উৎপাদন / ক্রয়		
০৪	পাহারা খরচ		
০৫	মাছের খাবারের খরচ		
০৬	বিবিধ খরচ		
মোট			
(খ)	মাছ বিক্রির টাকা পাওয়ার পরের খরচ		
০৭	মৎস্য আহরণ খরচ		
০৮	মৎস্য পরিবহন খরচ		
০৯	তহবিল গঠন খরচ (সুদ ইত্যাদি)		
১০	বিবিধ খরচ		বকেয়া পোনা, সার, খাবার কেনার খরচ ইত্যাদি
মোট			
সর্বমোট			

ট) তহবিল গঠনঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকারী	বিনিয়োগের পরিমান (টাকা)	মন্তব্য
১	পাবসস তহবিল থেকে বিনিয়োগ		
২	পাবসস সদস্যদের বিনিয়োগ		
৩	অসদস্যদের বিনিয়োগ		
৪	পাবসস কর্তৃক ঋণ গ্রহণ		
মোট			

* অধিকাংশ পাবসস তহবিলে মৎস্য চাষ উপ-প্রকল্পে খাটানোর মত টাকা থাকে না। তাই মৎস্য তহবিল যোগাড় করার জন্য একটি অনুসরণীয় পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

মৎস্য উৎপাদনের জন্য মৎস্য তহবিল থেকে সম্ভাব্য বিনিয়োগের পর বাকী টাকা একশত টাকা মূল্যের শেয়ারে ভাগ করে পাবসস সদস্যদের কাছে ঐ শেয়ার বিক্রি করে মৎস্য উৎপাদন তহবিল গঠন করা যায়। এভাবে শেয়ার বিক্রি করেও সমুদয় খরচ যোগাড় না হলে বাকী টাকা নিম্ন উপায় সংগ্রহ করা যাবে।

ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ (নির্ধারিত শর্তে)

খ) ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ

মৎস্য উৎপাদন তহবিলের টাকা একটি ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখা যাবে- যা সংশ্লিষ্ট পাবসস হতে দুই জন প্রতিনিধি এবং মৎস্য উপ-কমিটির দলনেতা এই তিন জনের নামে খোলা হবে। এই কমিটি এটি পরিচালনা করতে পারবে।

ঠ) মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমের আয় বন্টন পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	খাত	অংশ (%)	মন্তব্য
১	পাবসস সাধারণ তহবিল		ঐচ্ছিক
২	অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন তহবিল		বাধ্যতামূলক
৩	পরবর্তী মৎস্য উৎপাদন তহবিলের জন্য সঞ্চয়		বাধ্যতামূলক
৪	মৎস্য শেয়ার ক্রেতাদের মুনাফা		ঐচ্ছিক
৫	অন্যান্য খাত		ঐচ্ছিক (জনহিতকর কাজে অনুদান ইত্যাদি)
	মোট	১০০%	

* মাছ বিক্রীর টাকা থেকে অপরিশোধিত উৎপাদন ব্যয় পরিশোধ করার পর যে মুনাফা থাকবে- তা বন্টন করার একটি নীতি নির্ধারন করে সংশ্লিষ্ট সকলের অনুমোদন নিতে হবে।

১.১৫ মৎস্য আবাস ও উৎপাদন হ্রাস ঃ

প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনার জন্য যে প্রধান চার ধরণের কার্যক্রম আছে তন্মধ্যে বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন উন্নয়ন এবং পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে মৎস্য আবাস সংকোচন, মৎস্য প্রজনন ও চলাচল ব্যহত হওয়ার ফলে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পায়।

ক) মৎস্য আবাস ও চলাচলের উপর প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রভাব ঃ

পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	পানি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	মৎস্য আবাসের উপর প্রভাব	
		নেতিবাচক	ইতিবাচক
১। বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন উপ-প্রকল্প (Flood Management & Drainage, FMD)	বন্যা নিরোধী বাঁধ নির্মাণ ও পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	মৎস্য আবাস সঙ্কোচন, মৎস্য চলাচল বিঘ্নিত	নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য মৎস্য বাস সৃষ্টি
২। নিষ্কাশন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (Drainage Improvement, DI)	পানি নিষ্কাশন খাল খনন ও পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	মৎস্য আবাস সঙ্কোচন	পানি নিষ্কাশন খালে মৎস্য আবাস সৃষ্টি
৩। পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্প (Water Conservation, WC)	খনন / বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরীকরণ	সেচের জন্য পানি তুলে নেবার ফলে মৎস্য বাস সঙ্কুচিত হতে পারে। রেগুলেটর বসানোর ফলে মৎস্য চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে	পানি সংরক্ষণ জলাধারটির গভীর অংশটি মৎস্য আবাস/অস্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম হিসেবে ব্যবহারযোগ্য
৪। সেচ এলাকা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (Common Area Development, CAD)	সেচ এলাকা ও ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সেচ নালা তৈরী/ উন্নয়নকরণ	-	সেচ নালা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মাছ পালনে ব্যবহারযোগ্য এবং উচ্চ চাপে প্রবাহিত পানি flow through পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে ব্যবহার করা যায়

এ ধরনের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ঃ

১.১৬ সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য চাষ ঃ

জলজ কৃষি কাজের সাথে সমন্বয় করে মৎস্য উৎপাদনের জন্য জলাভূমির যথা সম্ভব বিস্তৃতি, গভীরতা ও স্থায়ীত্ব সংরক্ষণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ উপ-প্রকল্পের প্লাবিত এলাকায় ১লা আষাঢ় থেকে ৩০শে আশ্বিন পর্যন্ত কমপক্ষে হাটু পানি জমিয়ে রেখে ধান ও মাছ একত্রে চাষ করার ব্যবস্থা নিলে মৎস্য আবাস হ্রাস জনিত নেতিবাচক অবস্থা নিরসন হবে।

১.১৭ মৎস্য-বান্ধব অবকাঠামো তৈরী ও পরিচালনা ঃ

মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো (Fish Friendly Infrastructure) যেমন- মাছ চলাচলের জন্য সুবিধাজনক রেগুলেটর, স্লুইস গেট ইত্যাদি নির্মাণ করা। পরিচালনা (Fish Friendly Operation) যেমন- মৎস্য পোনা প্রবেশের জন্য গেট খোলা রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম দ্বারা মৎস্য চলাচল (Fish Migration) সম্পর্কিত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা যায়।

১.১৮ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় মৎস্য বিষয়ক কর্মসূচির বিবরণ ঃ

১.১৮.১ প্রথম পর্যায় ঃ

উপ-প্রকল্প নির্মাণের পূর্ব অবস্থা ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম	মৎস্য কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম	কার্যক্রম সম্পাদনকারী	পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান	মৎস্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর	প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মৎস্য খাতের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ	স্থানীয় উপকারভোগী এবং ইউনিয়ন পরিষদ	এলজিইডি'র মাঠ কর্মী
প্রাথমিক মাঠ পরিদর্শন	(ক) মৎস্য জলা চিহ্নিত করণ (খ) সরকার বা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকা বা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ- যা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হবে	এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী, কমিউনিটি অর্গানাইজার, সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী
উপজেলা পরিষদের সভায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন	নিশ্চিত করতে হবে- ক) প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প কোন সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থিত নয় এবং খ) উপ-প্রকল্প এলাকায় ৩০% এর বেশী মৎস্য জীবি পরিবার নাই। কারণ ৩০% এর বেশী মৎস্য জীবি থাকলে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে	উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রাক বাছাই (Pre-screening)	নিশ্চিত করতে হবে যে- মৎস্য সম্পর্কিত তথ্য যথাযথ ভাবে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা	আইডব্লিউআরএম'র পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়ন বিভাগ	আইডব্লিউআরএম'র নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ

প্রকল্প কার্যক্রম	মৎস্য কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম	কার্যক্রম সম্পাদনকারী	পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
মাঠ সমীক্ষা (Reconnaissance)	ক) উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে প্রদত্ত মৎস্য খাত সম্পর্কিত তথ্য মাঠের বাস্তব অবস্থার সাথে মিল আছে তা নিরূপন করতে হবে। খ) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মৎস্য খাতে কি প্রভাব পড়বে তা নিরূপণ	আইডব্লিউআরএম'র পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়ন বিভাগ ও প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ	আইডব্লিউআরএম'র নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
অংশগ্রহণ মূলক পল্লী সমীক্ষা (PRA)	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প সম্পর্কে তিনটি বিষয় স্থানীয় জনগণের মতামত যাচাই করতে হবে- ক) মৎস্য খাতের বর্তমান অবস্থা, খ) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কি প্রভাব পড়বে এবং গ) কিভাবে তা প্রশমন করা যাবে ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে	চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ফার্মের মৎস্যবিদ, (সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার ও মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর তথ্য সরবরাহ করবেন)	নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, আইডব্লিউআরএম; প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study)	মৎস্য খাত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে মৎস্য খাতের বর্তমান অবস্থা, অবকাঠামো তৈরী ও পরিচালনার প্রভাব নিরূপণ ও প্রশমন, মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত সম্ভাব্য অবস্থা যাচাই	সংশ্লিষ্ট ফার্মের মৎস্যবিদ, সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার ও মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর এর তথ্য প্রদান	এলজিইডি'র আইডব্লিউআরএম এর পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়ন বিভাগ, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষণ (আইইই)	উপ-প্রকল্পের মৎস্য পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং আইইই তে সন্নিবেশ করণ	প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য নিয়োজিত (FSDD) ফার্ম	আইডব্লিউআরএম ইউনিট এর পরিবেশ ও সংরক্ষণ শাখা; প্রকল্প পরামর্শকের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
জেলা আন্তঃ সংস্থা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উপ-প্রকল্প প্রস্তাব ছাড় করণ (DLIAPEC)	নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি মৎস্য অধিদপ্তরের কোন কার্যক্রমের অধিক্রমন বা দ্বৈততা হবে না	জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর

১.১৮.২ দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

উপ-প্রকল্প নির্মাণ ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম	মৎস্য কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম	মৎস্য কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পাদনকারী	পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
ক) কমিউনিটি অর্গানাইজারদের প্রশিক্ষণ	ক) মৎস্য কর্মসূচি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ক) সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	(ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর; প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
অবকাঠামোর কারিগরি নক্সা প্রণয়ন	নিশ্চিত করতে হবে যে- উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোর নক্সা মৎস্য বান্ধব রূপে প্রণয়ন করা হয়েছে	এফএসডিডি (FSDD) ফার্মের মৎস্যবিদ	আইডব্লিউআরএম এর পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়ন বিভাগ
স্থানীয় জনগণের সাথে অবকাঠামো নক্সার ধারণা আলোচনা	স্থানীয় জনগণের কাছে মৎস্য বান্ধব অবকাঠামোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা	এফএসডিডি ফার্ম, উপজেলা প্রকৌশলী, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	প্রকল্পের জুনিয়র পানি সম্পদ প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়ন বিভাগ, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রণয়ন	Environmental Mitigation Plan (EMP) তে মৎস্য বিষয়ক প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করণ	ডিএফএসডি ফার্মের মৎস্যবিদ; মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	আইডব্লিউআরএম এর পরিবেশ ও নিরাপদকরণ বিভাগ, প্রকল্প পরামর্শকের পরিবেশ/মৎস্য বিশেষজ্ঞ
উপকার ভোগীদের তালিকা প্রণয়ন	ক) মৎস্য পরিবারসমূহ তালিকা ভুক্তকরণ খ) মৎস্য কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণ যোগ্য গরীব পরিবারের তালিকা প্রণয়ন	কমিউনিটি অর্গানাইজার, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
চূড়ান্ত আলোচনা ও নক্সা অনুমোদন	নিশ্চিত করতে হবে যে- মৎস্য বান্ধব অবকাঠামোর নক্সা আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে	এফএসডিডি ফার্ম, উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	প্রকল্পের জুনিয়র পানি সম্পদ প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম এর পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়ন বিভাগ, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর	নিশ্চিত করতে হবে যে, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তিতে মৎস্য খাতে বিরূপ প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনাসহ বিরূপ পরিবেশ প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে	জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	আইডব্লিউআরএম, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য/পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
পাবসস কর্তৃক নির্মাণ কাজ তদারকী	অবকাঠামো নির্মাণকালে মৎস্য বান্ধব নক্সা অনুযায়ী অবকাঠামো তৈরী নিশ্চিত করণ	পাবসসের অবকাঠামো নির্মাণ পর্যবেক্ষণ কমিটি	উপজেলা প্রকৌশলী

প্রকল্প কার্যক্রম	মৎস্য কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম	মৎস্য কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পাদনকারী	পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
অবকাঠামো নির্মাণ তদারকী	এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো মৎস্য বান্ধব নক্সা অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে	নির্মাণ কাজ তদারককারী কার্য সহকারী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পাবসসের নির্মাণ পর্যবেক্ষণ কমিটি	উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্প পরামশকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান	পাবসসের মৎস্য কর্মসূচি (১৪টি) বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান	মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা	মৎস্য কর্মসূচি ভিত্তিক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	কমিউনিটি অর্গানাইজার, প্রকল্প সোসিওলজিস্ট, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ

১.১৮.৩ তৃতীয় পর্যায় ঃ

প্রথম বছরের যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

প্রকল্প কার্যক্রম	মৎস্য কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম	মৎস্য কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পাদনকারী	পরিবীক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ
অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সাব-কমিটি তৈরী এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন	মৎস্য বান্ধব পরিচালনা নিশ্চিতরকণ	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, কমিউনিটি অর্গানাইজার, মৎস্য ফ্যসিলিটেটর	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ
পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	মৎস্য খাতে বিরূপ প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, কমিউনিটি অর্গানাইজার, মৎস্য ফ্যসিলিটেটর	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর, প্রকল্প পরামর্শকের মৎস্য বিশেষজ্ঞ

১.১৯ মৎস্য জীবিদের মাছ ধরার সুযোগ ও আয় হ্রাস ঃ

মৎস্যজীবিগণ প্রাকৃতিক জলার মৎস্য উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। উপ-প্রকল্পে পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার ফলে জলার আয়তন, স্থায়ীত্ব ও মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং প্রায়শই মৎস্য জলাগুলো পাবসস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই মৎস্যজীবিগণের মাছ ধরার সুযোগ ও আয় কমে যায়। জীবিকা নির্বাহের জন্য মৎস্যজীবিগণ মাছ ধরার পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হন।

এ ধরনের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয় ঃ

- পাবসস নিয়ন্ত্রিত মাছ উৎপাদন কার্যক্রমে মৎস্যজীবিদেরকে নিয়োগ করা যায় (বেশ কয়েকটি উপ-প্রকল্পে এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে)।
- মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত বিকল্প পেশা গ্রহণ করার জন্য মৎস্যজীবিগণকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবিগণের পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্পের মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Fisheries Development Plan) অনুযায়ী বিবিধ পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক) মৎস্য খাত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন পদ্ধতি ঃ

নেতিবাচক প্রভাব	কারণ	প্রশমন পদ্ধতি
মাছের উৎপাদন হ্রাস	(ক) মৎস্য আবাস সংকোচন	মাছ ও ধান একত্রে উৎপাদনের জন্য জলাভূমির যথাসম্ভব বিস্তৃতি, গভীরতা ও স্থায়ীত্ব সংরক্ষণ
	(খ) প্রজননকারী মাছ ও পোনা মাছের প্রবেশপথ হ্রাস	মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো তৈরী ও পরিচালনা ব্যবস্থা
মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার সুযোগ ও আয় হ্রাস	(ক) প্রাকৃতিক জলাশয়ের মৎস্য চারণ ক্ষেত্র সংকোচন/বিলোপ/ ব্যবহারের সুযোগ হারানো	পাবসস নিয়ন্ত্রিত মাছ উৎপাদন কার্যক্রমে মৎস্যজীবিদেরকে নিয়োগ, মৎস্য সম্পর্কিত বিকল্প কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবিদের পুনর্বাসনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ
	(খ) উৎপাদন হ্রাস	উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদনবৃদ্ধি

১.২০ পাবসসের মাধ্যমে টেকসই মাত্রায় মৎস্য উৎপাদন ঃ

প্রকল্পের মৎস্য বিষয়ক কর্মসূচির উপ-প্রকল্প ভিত্তিক অন্যান্য কার্যক্রমের মতই উপ-প্রকল্প এলাকায় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেকসই মাত্রার মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা। পাবসস এর মাধ্যমেই মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

এ জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঃ

- মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাবনাময় উপ-প্রকল্প নির্বাচন
- উপ-প্রকল্প এলাকার মৎস্য উৎপাদন যোগ্য জলাভূমির সংগঠন
- লাগসই প্রযুক্তি খাটিয়ে সর্বাধিক টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা
- যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান
- উৎপাদনকারীগণকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করণ

প্রকল্পের দুইটি উৎপাদনমূখী কার্যক্রমের মধ্যে মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচি একটি। পানিময় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি প্রকল্পেই লাগসই প্রযুক্তি খাটিয়ে মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। মৎস্য উৎপাদনের কাজে গরীব জনগণই সম্পৃক্ত হয় বেশী পরিমানে এবং নারীরাও এখন পারিবারিক মৎস্য চাষে নিয়োজিত হন। তাই দারিদ্রতা হ্রাস এবং নারীদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য মৎস্য কর্মসূচির বিশেষ অবদান রয়েছে। উপ-প্রকল্প সমূহে মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পাবসস ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন এবং মৎস্য উপ-কমিটি মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে সহায়তা দেবে।

অধিবেশন - ২

মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল

২.১ কার্যক্রম ঃ

উপ-প্রকল্প অনুমোদন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মৎস্য ব্যবস্থপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় (টেবিল "ক" ও "খ")। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে এলজিইডি'র আইডব্লিউআরএম ইউনিটের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রয়োজন মত সহায়তা দান করা হয়।

চিত্র-১কঃ বন্যা নিরোধ উপ-প্রকল্পের শুষ্ক মৌসুমের অবস্থা।	চিত্র-১খঃ বন্যা নিরোধ উপ-প্রকল্পের বর্ষাকালীন প্লাবিত জলাভূমি। এই জলাভূমিতে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।	চিত্র-১গঃ বন্যানিরোধ উপপ্রকল্পের বন্যা নিরোধী বাঁধের ফলে জলাভূমি হ্রাস
চিত্র-২কঃ পানি নিষ্কাষণ খাল খনন করা হচ্ছে।	চিত্র-২খঃ পানি নিষ্কাষণ খালে মৎস্য উৎপাদন উপযোগী জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে।	
চিত্র-৩কঃ পানি সংরক্ষণ জলাধারের রেগুলেটর।	চিত্র-৩খঃ পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পের জলাধারে মাছ চাষ করা হয়েছে।	চিত্র-৩গঃ পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পে চাষকৃত মাছ পালানো নিরোধী জাল লাগানো হয়েছে।

চিত্র-৪কঃ সেচ এলাকা বৃদ্ধিও উপ-প্রকল্পে পানি পাম্প করে উঠানো হচ্ছে।

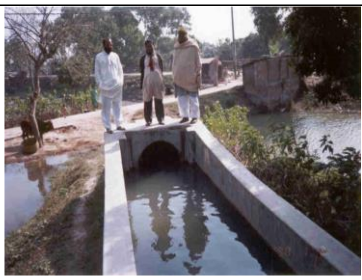

চিত্র-৪খঃ সেচ এলাকা বৃদ্ধিও উপ-প্রকল্পের সেচ নালা।

চিত্র-৪গঃ এসব সেচ নালায় বিশেষ উপায় মাছ চাষ সম্ভব।

চিত্র-৫কঃ উপ-প্রকল্প এলাকার মৎস্যজীবি সম্প্রদায়। প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ফলে তাহারা সাধারণতঃ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চিত্র-৫খঃ উপ-প্রকল্প এলাকার প্রাকৃতিক মৎস্য। প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ফলে এ সব প্রকৃতিক মৎস্য সাধারণতঃ কমে যায়।

চিত্র-৫গঃ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত শামুক।

ক) উপ-প্রকল্পে মৎস্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংক্ষেপ ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে মৎস্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	মৎস্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম
১ম পর্যায়: উপ-প্রকল্প নির্মাণ পূর্ব	
উপজেলা উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব নিরীক্ষণ ও অনুমোদন	মৎস্য বিষয়ক তথ্য ও প্রস্তাব নিরীক্ষণ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাব বাছাই ও মাঠ নিরীক্ষণ (রিকোনাইসেন্স)	মৎস্য বিষয়ক তথ্য ও প্রস্তাব নিরীক্ষণ
পিআরএ (অংশগ্রহণমূলক মাঠ সমীক্ষা)	উপ-প্রকল্প এলাকার মৎস্যজীবিদের মতামত যাচাই
উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে মৎস্য খাতর বর্তমান অবস্থা, অবকাঠামো তৈরীর সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রশমন এবং মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন
২য় পর্যায়: উপ-প্রকল্প নির্মাণ	
অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন	মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো নক্সা তৈরী প্রণয়ন
উপ-প্রকল্পের সুফল ভোগীদের সাথে অবকাঠামো ডিজাইন আলোচনা	মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো নক্সা সম্পর্কে সুফল ভোগীদের সাথে আলোচনা
সুফলভোগী খানা জরীপ	মৎস্যজীবি খানা জরীপ ও ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবি খানা চিহ্নিতকরণ
অবকাঠামো তৈরী	মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো তৈরী নিশ্চিতকরণ
৩য় পর্যায়: প্রথম বছরের যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	
সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম *
৪র্থ ও ৫ম পর্যায়: টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। মৎস্য খাতর পরিকল্পনা, সম্পাদিত কার্যক্রম পুনবীক্ষণ ও বাড়তি সহায়তার ব্যবস্থাকরণ	

*মৎস্য কর্মসূচির অধিকাংশ কার্যক্রম এ পর্যায় বাস্তবায়িত হয়।

খ) উপ-প্রকল্পে ৩য় পর্যায় মৎস্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংক্ষেপ (উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর) ঃ

পর্ব	মাঠ কার্যক্রম
১ম (জরীপ ও নির্বাচন)	১. মৎস্য খাত জরীপ ও মৎস্য খাতর ম্যাপ তৈরী (অবকাঠামো তৈরীর আগে ও পরে)। ২. মৎস্য খাত প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ এবং মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনাও সম্ভাব্যতা নিরূপণ। ৩. মৎস্য গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প হিসাবে নির্বাচন।
২য় (উন্নয়ন ও প্রস্তুতি)	৪. মৎস্য উপ-কমিটি গঠন ৫. মৎস্য কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬. খাস জলাশয়ের লীজ গ্রহণের জন্য দরখাস্ত পেশ ৭. মৎস্য খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ৮. মৎস্য পোনা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ৯. মৎস্য পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থাকরণ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপনা ক) সম্ভবনাময় মৎস্য উৎপাদন খাত নির্বাচন খ) সংশ্লিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ গ) সঠিক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ ১০. নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন পদ্ধতির প্রদর্শনী খামার স্থাপন ১১. মৎস্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
৩য় (উৎপাদন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)	১২. বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মৎস্য উৎপাদন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ১৩. তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)

মৎস্য কর্মসূচি পঞ্জিকা (উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ৩য় পর্যায়)

ক্র নং	মৎস্য কর্মসূচি সম্পর্কিত কার্যক্রম	অবকাঠামো তৈরী, ১৮ মাস, ২টি শুষ্ক মৌসুম																		যৌথ কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণ, ১২ মাস											
		জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	জা	ফে	মা	এ	মে	জু
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
		শুষ্ক মৌসুম					বর্ষা মৌসুম							শুষ্ক মৌসুম					বর্ষা মৌসুম							শুষ্ক মৌসুম					
১	মৎস্য সেক্টর জরীপ।																														
২	মৎস্য সেক্টরে প্রকল্পের প্রভাব ও মৎস্য উৎপাদন সম্ভাবনা নিরূপণ।																														
৩	মৎস্য গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প হিসাবে নির্বাচন।																														
৪	মৎস্য উপ-কমিটি গঠন।																														
৫	মৎস্য কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ																														
৬	খাস জলাশয়ের লীজ গ্রহণের জন্য দরখাস্ত পেশ।																														
৭	মৎস্য সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পা প্রণয়ন।																														
৮	মৎস্য পোনা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।																														
৯	মৎস্য পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থাকরণ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন।																														
১০	ক) সম্ভাবনাময় মৎস্য উৎপাদন খাত নির্বাচন																														
	খ) সংশ্লিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশক্ষণ চাহিদা নিরূপণ																														
	গ) সঠিক প্রশক্ষণার্থী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ																														
১১	নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন পদ্ধতির প্রদর্শনী খামার স্থাপন																														
১২	মৎস্য অদিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ																														
১৩	বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মৎস্য উৎপাদন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন																														
১৪	তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ																														

জুন-ডিসেম্বর= বর্ষা মৌসুম। জানুয়ারী-মে= শুষ্ক মৌসুম

২.২ মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল অনুযায়ী উপ-প্রকল্প পর্যায় পাবসসের মাধ্যমেই মৎস্য বিষয়ক সমুদয় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা দান করবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, সহায়তাকারী ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ।

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠান ঃ

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠান	কার্যক্রম
১	এলজিইডি/প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও তদারকী
২	প্রকল্প পরামর্শকবৃন্দ (Project Consultants)	প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরী পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান
৩	সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Partner Agencies)	
	ক) পিআরএ পরিচালনাকারী ফার্ম	অংশগ্রহণমূলক পল্লী সমীক্ষা: মৎস্য উৎপাদন
	খ) সম্ভাব্যতা যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান	উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ পর্যায় সম্ভাব্যতা পরীক্ষণ: মৎস্য উৎপাদন
	গ) ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগকারী এনজিও	মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর সরবরাহ
	ঘ) মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই	মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরী সহায়তা দান
৪	পাবসস	উপ-প্রকল্পে মৎস্য কর্মসূচি সম্পর্কিত সমুদয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানিসম্পদ উন্নয়ন খাত প্রকল্পে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	পর্যায়	প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (কমিটি)	সম্পৃক্ত মৎস্য মন্ত্রনালয় / অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততার ধরন	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/কর্মকর্তা
১.	আন্ত:মন্ত্রণালয়	"স্টিয়ারীং কমিটি"	সদস্য	মৎস্য অধিদপ্তর
২.	আন্তঃমন্ত্রনালয়	আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রকল্প জলমহাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং কমিটি	সদস্য	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়
৩.	জেলা	আন্ত:সংস্থা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি	সদস্য	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৪.	জেলা	জেলা ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কমিটি	সদস্য	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৫.	জেলা	জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি	সদস্য	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৬.	উপজেলা	স্থানীয় দ্বন্দ নিরসন কমিটি	সদস্য	সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৭.	উপজেলা	উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি	সদস্য	সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৮.	উপজেলা	উপজেলা জলমহাল কমিটি	সদস্য	সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

অধিবেশন - ৩

মৎস্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই'র সম্ভাব্য ভূমিকা ঃ

৩.১ মৎস্য অধিদপ্তর ঃ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তর প্রকল্পের মৎস্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রেক্ষিতে এলজিইডি মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক কমিটিতে মৎস্য অধিদপ্তর সদস্য হিসবে সম্পৃক্ত আছে।

পাবসসের মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমে মৎস্য অধিদপ্তরের কাংখিত সহায়তার বিবরণ ঃ

ক্র.নং.	মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম	সহায়তার ধরন
১	মৎস্য উপ-কমিটি গঠন	পরামর্শ
২	জলাভূমি সংগঠন	লীজ গ্রহণে সহায়তা
৩	মৎস্য উৎপাদন যোগ্য জলাভূমির পরিমাণ নির্ধারণ	পরামর্শ ও মাঠপর্যায়ে সহায়তা
৪	পোনার গুনগতমান, প্রজাতি, আকার ও পরিমাণ	জলাশয়ের প্রকার, আয়তন ও চাষপদ্ধতির ভিত্তিতে পোনার প্রজাতি, আকার ও পরিমাণ নির্ধারণ, প্রত্যেক্ষ সহায়তা দান
৫	পাবসস নিয়ন্ত্রিত মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচির কার্যক্রম	
(ক)	ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম	
৫.১	উৎপাদন কর্মসূচি ও জলাশয় নির্বাচন	প্রত্যক্ষ সহায়তা (চাষ পদ্ধতি ও উৎপাদন নিশ্চতকরণ
৫.২	উৎপাদন খরচ প্রাক্কলন প্রস্তুত করণ	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দান
৫.৩	তহবিল গঠন	পরামর্শ
৫.৪	আয় বন্টন পরিকল্পনা	পরামর্শ
৫.৫	রেকর্ড সংরক্ষণ	নির্দেশনা ও পরামর্শ
(খ)	উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম	
৫.৬	পোনা মজুদপূর্ব কার্যক্রম: জলাভূমি প্রস্তুত করণ	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দান
৫.৬.১	পানি/মাছ চলাচল	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৬.২	কাদা/অবাঞ্চিত মাছ/আগাছা অপসারণ	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৬.৩	পানির গভীরতা/গুনাগুন পরীক্ষণ	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৬.৪	চুনা/সার প্রয়োগ	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৭	পোনা মজুদ কার্যক্রম: চাষের প্রজাতি নির্বাচন	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৭.১	পোনার উৎস্য নির্বাচন	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৭.২	পোনা সংগ্রহ ও মজুদকরণ	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দান
৫.৮	পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দান
৫.৮.১	নিরাপত্তা ব্যবস্থা	পরামর্শ
৫.৮.২	অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণ	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৮.৩	জলাশয়ের জৈব পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ (পানির গুনাগুন গভীরতা সংরক্ষণ)	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৮.৪	মাছের বৃদ্ধি ও মজুদ পরীক্ষা	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৮.৫	সার/খাদ্য প্রয়োগ	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৫.৮.৬	মাছের রোগবালাই দমন	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৬.	মৎস্য আহরণ ও বিপনন (বাজার যাচাই করে)	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দান
৬.১	মৎস্য আহরণ কর্মসূচি প্রণয়ন	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৬.২	আহরণ প্রস্তুতি	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৬.৩	আহরণ প্রক্রিয়া	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান
৬.৪	বিপনন	প্রত্যক্ষ সহায়তা দান

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে মৎস্য বিষয়ক কর্মসূচিতে মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতার সম্ভ্যাব্য ক্ষেত্রসমূহ ঃ

ক্র.নং.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়	মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম	মৎস্য অধিদপ্তরের সরবরাহ ও ক্ষেত্র	মন্তব্য
১	প্রকল্প অনুমোদনের আগে	রিকোনেসেন্স পিআরএ সম্ভ্যাব্যতা যাচাই	প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ ও মতামত প্রদান	
২	অবকাঠামো তৈরীর আগে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যায়	মৎস্য বান্ধব অবকাঠামোর নক্সা প্রণয়ন	প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য সরবরাহ	
২.১		মৎস্য উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন (সম্ভাব্য) মৎস্য উৎপাদন প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন ব্যবস্থা।	প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, পরামর্শ প্রদান ও সহায়তা দান প্রকল্পভূক্ত এলাকায় সুফলভোগীদের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রকল্পের অর্থ প্রাপ্তিতে সহায়তা দান	
২.২	অবকাঠামো তৈরীর পর্যায়	মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো তৈরী নিশ্চিতকরণ	পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ	
২.৩		প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান পাবসস মৎস্য অধিদপ্তর	গ্রহণ ও প্রদান প্রদান প্রদান গ্রহণ	
৩	অবকাঠামো তৈরীর পর (হস্তান্তরের আগে)	মৎস্য উৎপাদনযোগ্য জলাশয় জরীপ ও মৎস্য জলার ম্যাপ তৈরী	তথ্য সরবরাহ ও মাঠ পর্যায়ে সহায়তা দান, প্রয়োজনে অংশ গ্রহণ	
৩.১		মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করণ	পরামর্শ ও সহায়তা দান	
৩.২		মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক বাড়তি প্রশিক্ষণ (প্রয়োজন মত)	প্রশিক্ষণ প্রদান	
৩.৩		বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন	পরামর্শ ও সহায়তা দান	
৩.৪		পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	তথ্য সরবরাহ ও সহায়তা দান	
৪	প্রকল্প হস্তান্তরের পর	বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়ন	পরামর্শ ও নির্দেশনা সহায়তা	
৪.১		পুন:প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ প্রদান	
৪.২		পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন (নির্ধারিত সময়ের জন্য)	তথ্য সরবরাহ ও সহায়তা	
৫	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম	এলজিইডি লোকবল প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ প্রদান	

৩.২ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বিএফআরআই মৎস্য উৎপাদনের লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রকল্পের উপকারভোগী মৎস্য উৎপাদনকারীগণকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেয়। এ জন্য এলজিইডি বিএফআরআই'র সাথে সমঝোতা চুক্তি হয়েছে।

অধিবেশন - ৪

মৎস্য উৎপাদন প্রযুক্তিতে স্মার্ট এ্যাকুয়াকালচার এবং পুকুরে কার্প (রুই) জাতীয় মাছের চাষ

৪.১ স্মার্ট এ্যাকুয়াকালচার

পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী মাছচাষ হলো পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন কলা কৌশলের ধারাবাহিক প্রয়োগ। সাধারণভাবে বলা যায় কোন একক জলায়তনে মাছের স্বাভাবিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি উৎপাদন পাওয়ার জন্যে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কলা কৌশলের প্রয়োগই হচ্ছে মাছচাষ। অর্থাৎ মাছ চাষে জলাশয়ের পরিবেশ মাছের সুস্থ্য ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হয়।

আমাদের দেশের রুই কাতলা জাতীয় মাছকে অথবা অনুরূপ জৈবিক স্বভাব বা দৈহিক গঠনের কয়েক প্রকার, মাছ যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল কালবাউশ, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প, কমনকার্প, মিররকাপ ইত্যাদি মাছকে কার্প জাতীয় মাছ বলা হয়। একই অথবা ভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ একত্রে একই পুকুরে চাষ করে পানির বিভিন্ন স্তরে (যেমন উপরের, মাঝের এবং নিচের স্তর) বিদ্যমান খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করাকে মিশ্র চাষ বলা হয়ে থাকে। মিশ্র চাষে আট ধরণের কার্পের পোনা একসাথে চাষ করা যায়। তবে সাধারণত দেশীয় কার্প রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছ একত্রে মিশ্র চাষ করা হয়। পুকুরে বড় আকারের পোনা ২৫০ গ্রাম-১.৫ কেজি পর্যন্ত বড় আকারের চাপের মাছ (Over Wintering) ও মজুদ করা হয় এবং অধিক ফলন নিশ্চিত করা যায়। বর্তমানে বড় আকারের বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মজুদের মাধ্যমে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন করে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে মাছচাষ করাকে স্মার্ট এ্যাকুয়াকালচার বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, পুকুরে মাছ চাষে বর্তমানে স্মার্ট একুয়াকালচার অনুসরন করা হচ্ছে। এ কথা অনস্বীকার্য মাছ চাষ একটি লাভজনক কার্যক্রম। বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষে পুকুরে মাছ চাষ অন্যতম। পুকুরে রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ এবং কৈ, তেলাপিয়া, গুলশা/পাবদা শিং মাছ চাষে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলি সম্পন্ন করতে হয়।

৪.২ পুকুরে কার্প জাতীয় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় ঃ

পুকুরে মাছ চাষে কৃষির মতই পুকুর প্রস্তুতি আবশ্যকীয় কার্যক্রম যা করতেই হয়।

(১) পুকুর প্রস্তুতি ঃ

- পুকুরের পাড় মেরামত।
- পুকুরের তলার কাদা অপসারন।
- আগাছা পরিস্কার এবং পাড়ের পাশের গাছপালার ডাল অপসারন।
- পুকুরে পানি থাকা অবস্থায় প্রস্তুতের জন্য রাক্ষুসে মাছ পরিস্কার করার জন্য রোটেনন ঔষধ ব্যবহার।

(২) চুন দেয়া ঃ

(৩) সার দেয়া ঃ

- জৈব সার
- অজৈব সার

(৪) চাষের জন্য মাছের পোনা মজুদ ঃ

- রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ।
- কৈ মাছ এবং সহযোগী প্রজাতির মাছের মিশ্র চাষ।
- তেলাপিয়া মাছ এবং সহযোগী প্রজাতির মাছের মিশ্রচাষ।
- শিং অথবা মাগুর মাছ এবং সহযোগী প্রজাতির মাছের মিশ্র চাষ।

(৫) মাছের পোনার পরিচর্যা ঃ

- দৈনিক খাদ্য দেয়া।
- সার দেয়া।
- ১ মাস পর পর জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজনে চিকিৎসা করা বা ব্যবস্থা নেয়া।
- ১ মাস পর পর জাল টানার পর চুন দেয়া।
- পানির প্রবাহ দেয়া বা পানি যোগ করা।

(৬) মাছ আহরন, বিক্রয় এবং নতুনভাবে পোনা মজুদ ঃ

- আহরন (মাছ ধরা)
- বিক্রয়
- পুনরায় পোনা মজুদ

পুকুরে রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ঃ (উন্নত সনাতন)

পুকুরে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষের ক্ষেত্রেও পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছ আহরন, বিপনন ও পুনরায় পোনা মজুদ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ একইভাবে অনুসরনীয় ঃ

(১) পুকুর প্রস্তুতি ঃ

১.১ পাড় মেরামত ঃ পুকুরের পাড় যদি ভাঙ্গা থাকে এবং বর্ষাকালে পুকুরের পানি বাইরে এবং বাইরের পানি পুকুরে আসতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে পুকুরের চাষের মাছ যেমন বাইরে যেতে পারে তেমনি বাইরের রাক্ষুসে মাছ ও অনাকাক্ষিত মাছ(আমাছা) বাইরে আসতে পারে কিংবা রোগ বালাই আসতে পারে যার কোনটাই ভাল নয়। সেজন্য মাছের পোনা মজুদের পাড় মেরামত করতে হবে।

১.২ পুকুরের তলার কাদা অপসারন ঃ পুকুর প্রস্তুতির অন্যতম একটি কাজ পুকুরের তলার কাদা মাছ চাষের শুরুতেই কমপক্ষে ১ ফুট বা কোদাল পরিমান তুলে ফেলা।তলার কাদায় সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইড(co_2),কার্বন মনোক্সাইড(co), মিথেন(CH_4), অ্যামোনিয়া(NH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড(H_2S) ইত্যাদি অনাকাক্ষিত গ্যাস থাকে। কাদা উঠিয়ে পাড় মেরামত করা যায় এবং পুকুর কয়েকদিন(৭ দিন) রৌদ্রে শুকিয়ে নিলে ভালো হয়।

১.৩ আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ পুকুরের পানির উপরের কিংবা পাড়ের কিংবা বাইরের বড় গাছের ডালপালা, পাতা পরিস্কার করে পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো তাপ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পানির উপরের আগাছা (কচুরীপানা, কলমিলতা, হেলেঞ্চা, আড়ালি ইত্যাদি) পানির পুষ্টি টেনে নেয়। যা মাছের জন্য খাদ্য তৈরীতে কাজে লাগতো তা এই আগাছা শুষে নেয়। ফলে পুকুরে মাছের খাদ্য তৈরীতে বিঘ্ন সৃস্টি হয়। এজন্য এগুলো পরিস্কার করতে হবে। অন্যদিকে পাড়ের কলাগাছের পাতা, চড়কা গাছ অথবা অন্য কোন বড় গাছের ডাল পানিতে ছায়ার সৃষ্টি করলে তা অপসারন করতে হবে।এসকল ডালপালা, পাতায় পানিতে ছায়ার সৃষ্টি করে। ফলে পানিতে মাছের খাদ্য তৈরীর অন্যতম উপাদান সূর্যের আলোর অভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যহত হয় এবং পানিতে মাছের জন্য কম খাদ্য তৈরী হয়।

ক্লোরোফিল+সূর্যের আলো+কার্বন ডাই অক্সাইড (Co_2) +পানি (H_2O) = কার্বোহাইড্রেট(শর্করা) ($C_6H_{12}O_6$)+অক্সিজেন(O_2)

কাদা অপসারনের ৭ দিন পর চুন দিতে হয়।

১.৪ ঃ রাক্ষুসে মাছ বা আমাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ

রাক্ষুসে মাছ (টাকি, বেলে, শোল ইত্যাদি) এবং আমাছা (চাঁদা, ডানকোনা, মায়া, পুটি ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রনের জন্য রোটেনন পাউডার ব্যবহার করা উচিৎ। বাজারে প্রাপ্ত রোটেনন যাতে বাতাস লাগে নাই এমন রোটেনন যা ৯ মাত্রার উহা শতক প্রতি ১ ফুট পানিতে ৩০-৩৫ গ্রাম হারে ব্যবহার করা উচিৎ। (১০ শতকের পুকুরের গড় ৫ ফুট পানি থাকলে ১০*৫*৩৫=১৭৫০ গ্রাম রোটেনন পাউডার লাগবে।) মোট পাউডারকে দুই ভাগ করে অল্প পানি দিয়ে আঠারমত খামির করে গুলি গুলি করে সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে।বাকি অর্ধেক ১৫ মিনিট পর বালতিতে বা হাড়িতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে। রোটেনন দেয়ার আধাঘণ্টা পর মাছ মরলে জাল টেনে সমস্ত মাছ ধরে নেয়া যায়। আবহাওয়ায় বাতাস যখন নিথর থাকে, রৌদ্রের সময় রোটেনন দিতে হবে। রোটেননে অমেরুদণ্ডী চিংড়ী মরবে না। বাজে চিংড়ি মারতে হলে রোটেননের সংগে শতক প্রতি ১ ফুট পানির গভীরতায় ১ মিলিমিটার করে সুমিথিয়ন গুলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

রোটেনন ঃ বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর রোটেনন বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। প্যাকেট করা রোটেনন পাউডার যা বাতাসের সংস্পর্শ লাগে নাই এমন পাউডার পরিমাণমত কিনে পুকুর পাড়ে এনে দুই ভাগ করতে হবে। এক ভাগে কিছু পানি মিশিয়ে খামির করে গুলি গুলি আকার করে সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে। ১৫ মিনিট পর বাকী রোটেনন পাউডার গুলি বালতিতে গুলে পুকুরে সমস্ত পানিতে সমানভাবে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে।

শতক প্রতি রোটেনন ব্যবহারের মাত্রা	১০০ শতকের পুকুরে ৫ ফুট পানি থাকলে	১/২ ঘণ্টা পর
শতকরা প্রতি/৩৫ গ্রাম/১ ফুট	১৭.৫০ কেজি	জাল টেনে মাছ ধরতে হবে।
পানির জন্য		

পানিতে নাড়াচাড়া কম দিতে হবে। বাতাস নিথর থাকা অবস্থায় এই পাউডার ছড়ানো ভাল। বৃষ্টির ভেতর এই পাউডার না দেওয়া ভাল। মাছ মরা শুরু হলে জাল টেনে সমস্ত মাছ ধরে নিতে হবে। রোটেনন পাউডার দিয়ে মারা মাছ খাওয়া যাবে।

(২) চুন দেয়া ঃ পুকুর প্রস্তুতির এই ধাপে পাথুরে চুন গুলিয়ে শতক প্রতি ১ কেজি তলায় এবং পাড়ে ছড়িয়ে দিতে হয়।এতে তলার অনাকাঙ্খিত গ্যাস নিয়ন্ত্রন, রোগ বালাই দমন, মাটি ও পানির পি এইচ নিয়ন্ত্রন হয়। মাছের জন্য পুকুরের পানিতে মাছের খাদ্য তৈরী হয়। তলার কাদা মাটিতে চুন দিয়ে ১ দিন পর কমপক্ষে৩-৪ ফুট পানি দিয়ে পুকুর ভরে দিতে হয়।

(৩) সার দেয়া ঃ

চুন দেয়ার ৩(তিন) দিন পরে পুকুরে জৈব ও অজৈব সার দিতে হয়।শতক প্রতি জেব ও অজৈব সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল

সারের নাম	সারের পরিমাণ
গোবর সার	৫-৭ কেজি
ইউরিয়া	১৫০-২০০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫-১০০ গ্রাম
এম ও পি	৩৫-৪০ গ্রাম

তবে সার ছড়ানোর সময় ইউরিয়া সার মেশানো ভাল। গোবর সার ৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে দেয়া ভাল। জৈব ও অজৈব সার একত্রে ভিজিয়ে পানিতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

(৪) মাছের পোনা মজুদ ঃ

সার দেয়ার ৩ (তিন) পর পুকুরে মাছের পোনা মজুদ করতে হয়। সেক্ষেত্রে রুই জাতীয় মাছের চাষে এক বছর বয়সী ৪”-৫” ইঞ্চি আকারের পোনা মাছ মজুদ করা ভাল। নিম্নে সরণী অনুসরণ করে পোনা মজুদ করা যায়।

সরনী-১ ঃ রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ঃ

পোনার প্রজাতির নাম	পোনার বয়স	পোনার আকার	পোনার স্বাস্থ্য	পোনার সংখ্যা(শতক প্রতি)
কাতলা	১ বছর	৪"-৫"	সুঠাম দেহ চঞ্চল এবংস্বচ্ছ,আইস না ছাড়ানো	১৫
সিলভার কার্প	"	৪"-৫"	"	১০
রুই	"	৪"-৫"	"	২৫
গ্রাস কার্প	"	৫"-৬"	"	৫
মৃগেল	"	৪"-৫"	"	২০
কালিবাউস	"	৪"-৫"	"	৫
ব্লাক কার্প	"	৫"-৬"	"	১

(৫) পোনার পরিচর্যা ঃ

৫.১: মাছের খাদ্য দেয়া ঃ

মাছের পোনা মজুদের পর পোনা মাছকে দৈনিক খাবার দিতে হবে। সেক্ষেত্রে মাছের শরীরের মোট ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ করে খাবার দিতে হয়। অর্থাৎ ১০০ কেজি মাছ থাকলে প্রতিদিন ঐ ১০০ কেজি মাছের জন্য ২-৩ কেজি সম্পূরক খাদ্য দিতে হয়।মাছের খাদ্য হল সরিষার খৈল, চালের কুড়া, গমের কুড়া, ভূট্টা ভাঙ্গা, সয়াবিন খৈল এবং মাছের চূর্ন বা ফিস মিল। এসকল খাবার একত্র করে রুই জাতীয় মাছকে খাওয়ানো যায়। সেক্ষেত্রে পাউডার অবস্থায় ভিজিয়ে অথবা দানাদার অবস্থায় দেয়া যায়। যে ভাবেই দেয়া হোক না কেন দেখার বিষয় হোল বানানো মিশ্র খাদ্যে যেন আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৮ ভাগ হয়। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানীর বানানো দানাদার খাবার বস্তায় পাওয়া যায়। যাতে আমিষের পরিমাণ বস্তার গায়ে লেখা আছে। ২৮% আমিষের এক্ষেত্রে এসিআই মেগাফিড, কোয়ালিটি ফিড এর দানাদার খাবার অন্যতম। পোনা মজুদের পর শতকরা ৩ ভাগ হারে খাবার দিতে শুরু করে শতকরা ২ ভাগ হারে শেষ করতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে, প্রতি সপ্তাহ অন্তরে ঐ হিসাবে মোট খাবারের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। মাছের ওজন বাড়ার সাথে সাথে খাবারের মোট পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু শতকরা হার উপরের বর্ণনানুসারে ঠিক থাকবে।

সরণী-২ ঃ

সপ্তাহ	**পোনা মাছের ওজন**	**পোনা মাছের প্রতিটির জন**	**দেয় খাদ্যের পরিমাণ**	**অন্যান্য**
১ম	১০০ কেজি	২৫.০০ গ্রাম	৩ কেজি	প্রতিদিন ২ বারে খাওয়াতে হবে
২য়	১২০ কেজি	৩০.০০ গ্রাম	৩.৬ কেজি	
৩য়	১৪৪ কেজি	৩৬.০০ গ্রাম	৪.৩২ কেজি	
৪র্থ	১৬৪ কেজি	৪১.০০ গ্রাম	৪.৯২ কেজি	
৫ম	১৮৪ কেজি	৪৬.০০ গ্রাম	৫.৫২ কেজি	
৬ষ্ট	২১৪ কেজি	৫৩.৫০ গ্রাম	৬.৪২ কেজি	

সরণী-৩ ঃ

৫.২ সার দেয়া ঃ পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় প্রতিদিন জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহার ঃ

সারের নাম	১০০ শতক প্রতি দৈনিক পুকুরে ১ বার দেয় সারের পরিমাণ	অন্যান্য
গোবর	৫-৭ কেজি	গোবর সার ২ দিন ভিজিয়ে দিতে হবে । এই সঙ্গে টিএসপি ভিজিয়ে দেয়া যায়। ইউরিয়া এবং এম ও পি ছড়িয়ে দেয়ার সময় মিশিয়ে দিলেই হয়।একত্রে মিশিয়ে পুকুরের পানিতে ছড়িয়ে দিতে হবে।
ইউরিয়া	১৫০-২০০ গ্রাম	
টিএসপি	৭৫-১০০ গ্রাম	
এম ও পি	৩৫-৪০ গ্রাম	

দৈনিক সার দিতে দিতে পুকুরের পানি গাঢ় সবুজ হয়ে গেলে এবং পুকুরের তলায় ও পানিতে গ্যাস লক্ষ্য করা গেলে সার দেয়া ২-৩ দিনের জন্য বন্ধ রাখা ভাল। তখন তলায় হররা অথবা জাল টেনে দেয়া ভাল। সার দেয়ার ৩ দিন পর জাল টেনে মাছের পোনা ছাড়তে হবে। কোন কারণে যদি সন্দেহ হয় পুকুরের পানিতে বিষাক্ততা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে ৩ দিন পর কিছু পোনা ছেড়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে যে, পোনা মরে কিনা। এদেরকে পরীক্ষার(Test-এর পোনা) পোনা মাছ বলা হয়। বিষাক্ততার প্রমাণ না পাওয়া গেলে সমস্ত পোনা মাছ ছেড়ে দিতে হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ঃ

পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ কাজটি কয়েকটি পদ্ধতিতে করা যায়, যেমন-হাত দিয়ে পরীক্ষা। পুকুরের পানিতে দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে হাত কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখতে পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার আছে। আর যদি হাতের তালু দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে প্রয়োজনীয় খাবার নেই।

সেক্কী ডিক্স দিয়ে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ঃ

সেক্কী ডিক্স হচ্ছে টিনের বা লোহার একটি সাদা কালো রংয়ের গোলাকার চাকতি যার ব্যাস ২০ সেঃ মিঃ। চাকতিটি সুতা দিয়ে ঝুলানো থাকে। হাত দিয়ে সুতা ধরে সেক্কি ডিক্স পানিতে ডুবানোর পর যে গভীরতা পর্যন্ত চাকতিটি দেখা যায় তদানুসারে উর্বরতা নির্ণয় করা যায়। যদি ২৫-৩৫ সেঃ মিঃ গভীরতায় দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে ভাল খাবার আছে। ৩৫ সেঃ মিঃ এর বেশী গভীরতায় সেক্কি ডিক্স দেখা গেলে বুঝতে হবে খাবার অত্যন্ত কম। তখন আরো সার দিতে হবে। সূর্যের আলোকিত দিনের বেলা ১১-১ টার মধ্যে সেক্কি ডিক্স বা হাত দিয়ে খাবার পরীক্ষা করুন। কখনো ঘোলা পানিতে পরীক্ষা করবেন না।

৫.৩ ঃ জাল টানা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ঃ

পোনা ছাড়ার ১ মাস পর জাল টেনে মাছ ধরে দেখতে হবে মাছের কাঙ্ক্ষিত দেহবৃদ্ধি হচ্ছে কিনা। প্রতিটি পোনা মাছ প্রতিদিন ২ গ্রাম হারে বাড়ছে কিনা। যদি বাড়ে এবং কোন রোগবালাই না থাকে তাহলে পানি মেরে নাল কাটিয়ে মাছ ছেড়ে দিতে হবে। যদি রোগবালাই লক্ষ্য করা যায় তাহলে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাকে দেখিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

৫.৪ ঃ চুন দেয়া ঃ

১ মাস পর জাল টানার দিন চুন দিতে হবে। সেক্ষেত্রে পূর্ব হতেই পরিমাণমত চুন এনে ভিজিয়ে রাখতে হবে। জাল টানার ২-৩ ঘন্টা পূর্বে চুন ভিজিয়ে দিতে হবে। চুন ঠাণ্ডা হলে পুকুরের পানিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিম্নে সরণী অনুযায়ী পুকুরে মাছ থাকা/চাষ অবস্থায় চুন দিতে হবে।

সরণী-৩ ঃ

পানির গড় গভীরতা(ফুট)	শতক প্রতি চুনের পরিমাণ (কেজি)	অন্যান্য
৫ ফুটের উপরে	১ কেজি	সম্ভব হলে মেশিন দিয়ে পি. এইচ পরীক্ষা করা ভাল
৫ ফুট পর্যন্ত	৫০০গ্রাম	
৪ ফুট পর্যন্ত	৩০০গ্রাম	
৩ ফুট পর্যন্ত	২০০গ্রাম	

৫.৫ ঃ পানির প্রবাহ ঃ

পুকুরে মাছ চাষ অবস্থায় পানিতে গ্যাস হলে বা মাছ অস্বাভাবিকভাবে মাছ ভেসে উঠছে লক্ষ্য করলে পুকুরের পানিতে পানির প্রবাহ দিতে হবে। প্রয়োজনে বাহির হতে নতুন/পরিস্কার পানি যোগ করতে হবে।

(৬) মাছ আহরণ, বিপনন ও নতুন করে মজুদ ঃ

পোনা মাছ মজুদের ৬ মাস পর বাজার আকৃতির হলে জাল টেনে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করতে হবে। এক্ষেত্রে বাজারের সমসাময়িক মূল্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

সরণী-৪ দ্রষ্টব্য ঃ

মাছের প্রজাতি(নাম)	বিক্রয় উপযোগী প্রতিটা মাছের ওজন
কাতলা	১ কেজির উপর
সিলভার কার্প	১ কেজির উপর
রুই	১/২ কেজির উপর

গ্রাস কার্প	১ $^{১}/_{২}$ কেজির উপর
মৃগেল	$১/_{২}$ কেজির উপর
কালিবাউস	$১/_{২}$ কেজির উপর
ব্লাক কার্প	২ কেজির উপর

প্রথমবার মাছ আহরণ ও বিপণনের পরে সংখ্যায় যতটা যে প্রজাতির মাছ বিক্রয় করা হল ঐ প্রজাতির পোনা মাছ ১০% বাড়ানো সংখ্যায় আবার মজুদ করতে হবে।বছর শেষে অথবা চাষ মৌসুম শেষে অথবা পুকুর নতুন করে প্রস্তুতি করার আগে সমস্ত মাছ উঠিয়ে বিক্রি করে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে পানি কমিয়ে বার বার জাল টেনে সমস্ত মাছ ধরে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং সবশেষে রোটেনন বিষ দিয়ে মাছ উঠিয়ে নিতে হবে।

রুই জাতীয় মাছ চাষে আয় ও ব্যয় ঃ

এক একর (১০০ শতক) জলাশয়ে মাছের চাষ এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

ক্রমিক নং	মাছের প্রজাতির নাম	শতক প্রতি পোনা প্রজাতির সংখ্যা	১০০ শতকে পোনা প্রজাতির সংখ্যা	৮ মাসে পোনার ওজন	মোট ওজন কেজি)	প্রতি কেজি মাছের বাজার মূল্য	প্রতি কেজি মাছের উৎপাদনে খাদ্যেও পরিমাণ (কেজি)	মোট খাদ্য কেজি	মোট খাদ্যের মূল্য	মোট মাছের মূল্য
১	কাতলা	১৫	১৫০০	১৫০০ কেজি (১কেজি হারে)	১৫০০	১৫০.০০	২ কেজি @৩০.০০	৩০০০		
২	সিলভার কার্প	১০	১০০০	৮৫০ কেজি(৮৫০গ্রাম হারে)	৮৫০	১০০.০০	”	১৭০০		
৩	রুই	২৫	২৫০০	১২৫০ কেজি (৫০০গ্রাম হারে)	১২৫০	১২৫.০০	”	২৫০০		
৪	গ্রাস কার্প	৫	৫০০	৭৫০ কেজি(১.৫ কেজি হারে)	৭৫০	১০০.০০	”	১৫০০		
৫	মৃগেল	২০	২০০০	১০০০ কেজি (৫০০গ্রাম হারে)	১০০০	১০০.০০	”	২০০০		
৬	কালিবাউস	৫	৫০০	২৫০ কেজি(৫০০ গ্রাম হারে)	২৫০	১২৫.০০	”	৫০০		
৭	ব্লাক কার্প	১	১০০	১৫০ কেজি(১.৫ কেজি হারে)	১৫০	১৫০.০০	”	৩০০		
৮	মোট	৮১	৮১০০	৫৭৫০ কেজি	৫৭৫০ কেজি	৮৫০ টাকা		১১৫০০ কেজি	৩,৪৫,০০০	৬,৯৫,০০০

প্রতি কেজি মাছের গড় মূল্য **১২০.০০**টাকা

লেবার, সার এবং অন্যান্য ব্যয় = ৩৫,০০০.০০ টাকা

মাছ উৎপাদনে ব্যয় = ৩,৪৫,০০০.০০টাকা

মোট = ৩,৮০,০০০.০০ টাকা

মোট আয় (মাছ বিক্রয় হতে) = ৬,৯৫,০০০.০০ টাকা

ব্যয় ও আয়ের অনুপাত = **১ঃ১.৮২**

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

১. যেহেতু মাছের বড় আকারের পোনা মজুদ করা হয়েছে উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে সেইহেতু মাছের মৃত্যুহার বিবেচনায় নেয়া হয় নাই।

২. গ্রাস কার্পের জন্য কলার পাতা, ঘাস ও ধানের বিছালী খাওয়ালে গ্রাস কার্প যেমন দ্রুত বড় হবে অন্যান্য মাছের খাবারের পর্যাপ্ততা বাড়বে এবং সে সকল মাছও দ্রুত বড় হবে।

৩. ১৫ দিন অন্তর শতক প্রতি ৫ ফুটের উপর পানিতে ৪০০ গ্রাম হারে এবং ৪ ফুট পানিতে ৩০০ গ্রাম হারে চুন দিতে হবে।

৪. থায়োডিন, থায়োনিল, ফসটকসিন বিষ (ঔষধ) দিয়ে পুকুরের রাক্ষুসে মাছ মেরে পুকুর প্রস্তুত করলে এই ফলন হবে না।

অধিবেশন - ৫

কার্প নার্সারি ব্যবস্থাপনা

লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য ভাল জাতের এবং বড় আকারের মানসম্পন্ন পোনা পাওয়া খুবই প্রয়োজন। সময়মত কাঙ্খিত আকারের পোনা না পাওয়ার জন্য অনেক মৎস্যচাষি ইপ্সিত উৎপাদন লাভে সমর্থ হয় না। ফলে দেশে সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন ব্যবহৃত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো উন্নত নার্সারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিক সময়ে ভল জাতের মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন। কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন কৌশল এ অংশে আলোচনা করা হলো।

৫.১ ঃ স্থান নির্বাচন ঃ

মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য পুকুরের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাটির বৈশিষ্ট্য সাধারণ মাছ চাষের পুকুরের মতই। এছাড়া আরো যে সব বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো পুকুর খননের এলাকা হবে বন্যামুক্ত ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

রুই জাতীয় মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণত দুই ধরণের পুকুর ব্যবহার করা হয়।

ক. নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর ঃ

যে পুকুরে রেণু ছেড়ে ধানী পর্যন্ত বড় করা হয়, তাকে নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুর সাধারণত ছোট থেকে মাঝারি আকারের হয়ে থাকে। পুকুরের গভীরতা থাকে তুলনামূলকভাবে কম। কাজেই যে সমস্ত ছোট, মাঝারি ও অগভীর পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনার আকার পর্যন্ত বড় করা হয়, সেগুলো আঁতুড় পুকুর নামে অভিহিত। এ পুকুরের আয়তন সাধারণত ১০-২৫ শতাংশ এবং পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট হয়ে থাকে। তবে প্রজাতি ভেদে আয়তন ও গভীরতার তারতম্য ঘটে থাকে।

খ. লালন বা চারা পুকুর

যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা (৫-১০ সেমি) পর্যন্ত বড় করা হয়, তাকে লালন বা চারা পুকুর বলে। বিভিন্ন ধরনের অগভীর বাৎসরিক পুকুর বা চাষাবাদ মৌসুমে পানির ব্যবস্থা থাকে, এমন ধরনের পুকুরে মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়। নার্সারি পুকুর এবং লালন পুকুরের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- পুকুরের পাড় উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত;
- পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো এবং বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- নার্সারি পুকুরের আয়তন হবে ১০-৫০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা হবে ১.০-১.৫ মিটার;
- লালন পুকুরের আয়তন হবে ২০-১০০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার হলে ভাল হয়;
- উভয় প্রকার পুকুর হবে আয়তাকার যাতে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়;
- পুকুরের তলায় ১০-১৫ সেমি -এর বেশি কাদা থাকবে না।

তবে একই পুকুরে একধাপ পদ্ধতিতেও রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়।

৫.২ ব্যবস্থাপনা ঃ

১. জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ

২. রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ

৩. পুকুর মেরামত ও চাষ দেয়া

৪. চুন প্রয়োগ বিষয়ে সাধারণ মাছচাষ অংশে আলোচিত হয়েছে।

৫. **পুকুরে পানি ভরাটকরণ ঃ** পুকুর শুকানো হলে চুন প্রয়োগের ২-৩ দিন পর পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানি সরবরাহ কালে যেন কোনো রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ ঢুকতে না পারে।

৬. **পোনা প্রাপ্তি নির্ধারণ ঃ** পুকুরে সার প্রয়োগের ৩-৮ দিনের মধ্যে ফাইটোপ্লাংকটন, ৫-১০ দিনের মধ্যে রটিফার, ৮-১৪ দিনের মধ্যে ক্লাডোসেরা এবং ১২-২০ দিনের মধ্যে কপিপডের উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় থাকে। রেণুর জন্য যেহেতু রটিফার জাতীয় খাদ্য দরকার। তাই রেণু প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ জেনে পুকুরে সার প্রয়োগ করলে পোনার উৎপাদন সবচেয়ে ভালো পাওয়া যাবে।

৭. **সার প্রয়োগ ঃ** পুকুরের নিজস্ব উৎপাদনশীলতার ওপর সার প্রয়োগের মাত্রা পুকুর থেকে পুকুরে ভিন্ন হয়। পুকুর প্রস্তুতকালীন সার ব্যবহারের মাত্রা নিম্নরূপ:

ইউরিয়া ঃ ১০০-৫০ গ্রাম / শতাংশ

টিএসপি ঃ ৫০-৭৫ গ্রাম / শতাংশ

পুকুরে পানির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে সার প্রয়োগের মাত্রা কম-বেশি হতে পারে। সার হিসেবে খৈলও ব্যবহর করা যেতে পারে। শতাংশ প্রতি ০.৫০ কেজি খৈল পুকুরে রটিফার (এক ধরণের প্রাণিকণা) উৎপাদনে সহায়ক।

৮. পানিতে প্রাকতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ ঃ

রেণু / ধানী মজুদের আগেই পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। রেণুর পুকুরে পানির রং থাকবে লালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ। খালি চোখে দেখতে হবে পানির রং ঠিক আছে কিনা। ঠিক থাকলে পরিমিত খাবার আছে কিনা তা নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে হবে।

সেকিডিস্ক ঃ

এটি একটি লোহার চাকা যার ব্যাস ২০ সেমি এবং রং সাদা -কালো। এটি ৩টি রংয়ের ১টি সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। থালার গোড়া থেকে প্রথম অংশের রং লাল (২ সেমি), দ্বিতীয় অংশের রং সবুজ (১০ সেমি) এবং হাতে ধরার সর্বশেষ অংশের রং সাদা।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা ঃ

পুকুরে রেণু / পোনা ছাড়ার অন্তত একদিন আগে পুকুরের পানির বিষাক্ততা দূর হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হয়। কেননা পানিতে বিষক্রিয়া থাকলে রেণু / পোনা মারা যাবে।

বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি : পুকুরে হাপা স্থাপন করে কিছু পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দেখা, পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে পানিতে বিষ ক্রিয়া হয়েছে এ অবস্থায় পুকুরে পোনা মজুদ উচিত নয়, কিছু দিন অপেক্ষা করার পর

আবারও বিষাক্ততা পরীক্ষা করে পোনা ছাড়া, পুকুরের বিষাক্ততার মাত্রা বেশি হলে পানি কমিয়ে এনে বা বদলিয়ে বিশুদ্ধ উৎসের পানি সংযোজন করতে হবে।

জলজ পোকা- মাকড় দমন ঃ

জলজ পোকা-মাকড় রেণু পোনার জন্য খুবই ক্ষতিকর। পুকুরের পানিতে এমনিতেই বিভিন্ন ধরনের জলজ পোকা-মাকড় জন্ম নেয়। যেমন-হাস পোকা (back swimmer), ড্রাগনফাই, ওয়াটার স্ট্রোক, আংগুলি পোকা (cutter piller) গোবর পোকা (water -bug) বড় আকৃতির জুপ্লাংকটন যথা-ক্লাডোসেরা, কপিপোড, (cyclops, daphina, diaptomas) ইত্যাদি। পুকুরে যখন সার প্রয়োগ করা হয় তখন প্রাকৃতিক খাদ্যের বৃদ্ধি ঘটে এবং এর সাথে সাথে রেণু পোনার জন্য ক্ষতিকর পোকা-মাকড় এর বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এরা রেণু পোনা ধরে খেয়ে ফেলে অথবা পেট কেটে মেরে ফেলে। এছাড়াও পোকা-মাকড় রেণুর খাদ্য নষ্ট করে ফেলে। রেণু ছাড়ার পূর্বে নার্সারি পুকুর হতে এ সমস্ত জলজ পোকা-মাকড় ভালোভাবে দমন করতে হয়।

জলজ পোকা-মাকড় দমন পদ্ধতি ঃ

বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক বা ডিজেল/ কেরোসিন প্রয়োগ করে নার্সারি পুকুরের জলজ পোকা-মাকড় ভালোভবে দমন করা যায়। নিচে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

- সুমিথিয়ন: ২-৩ মিলি / শতাংশ / ফুট পানির গভীরতা;
- নোভান/ নগস: ২-৩ মিলি / শতাংশ / ফুট পানির গভীরতা।
- হাঁসপোকা সহ ক্ষতিকারক পোকা দমন- নার্সারি পুকুরে রেনু অবমুক্ত করার ৫৬-৭২ ঘন্টা পূর্বে ৩-৪ ফুট গভীরতার জন্য ডেলিট্রিক্স ১.৫ মি.লি./শতাংশ হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম টিমসেন (৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া) প্রয়োগ করলে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনুপোনাগুলো রক্ষা পায়।

কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি ঃ

প্রয়োজনীয় কীটনাশক একটি পাত্রের মধ্যে ১০ লি. পরিমাণ পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ডিপটারেক্স প্রয়োগের পর জলজ পোকা-মাকড় মারা যাওয়া শুরু করলে সমস্ত পোকা-মাকড় চটজাল দ্বারা তুলে ফেলতে হবে। দুপুরে রোদে ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। কম তাপমাত্রা, মেঘ, কিংবা বৃষ্টির সময় কীটনাশক ব্যবহার না করাই উচিত।

কীটনাশক ব্যবহারের সতর্কতা ঃ

- কীটনাশক ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীকে মুখ, শরীর কাপড়ে ঢেকে নিয়ে চশমা পরে নিতে হবে;
- বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে;
- ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভাল করে গোসল করে নিতে হবে এবং সকল প্রকার কীটনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

ডিজেল বা কেরোসিন ঃ

- প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১২৫ মিলি বা প্রতি ১০ শতাংশ জলাশয়ে ১ লি. প্রয়োগ করতে হবে (গড়ে পানির গভীরতা ৩ ফুট)।
- পুকুরের পানি যখন ঢেউহীন অবস্থায় থাকবে তখন প্রয়োগ করতে হবে।
- পুকুরের পানিতে ঢেউ থাকলে চটজাল টেনে জালের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রক্রিয়া ২/৩ বার করলে ভাল হয়।
- সমস্ত মরা পোকা-মাকড় তুলে ফেলতে হবে।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ঃ

রেণু পোনা দুই পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা যায়। এ পদ্ধতি নির্ভর করে রেণু ছাড়ার পরিমাণের ওপর। এর পরিমাণ আবার নির্ভর করে রেণুর জাত, পুকুরের আয়তন ও তার উৎপাদনশীলতার ওপর। ছোট ও মাঝারি পুকুর অধিকতর উৎপাদনশীল বলে বিবেচিত। চাষির অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

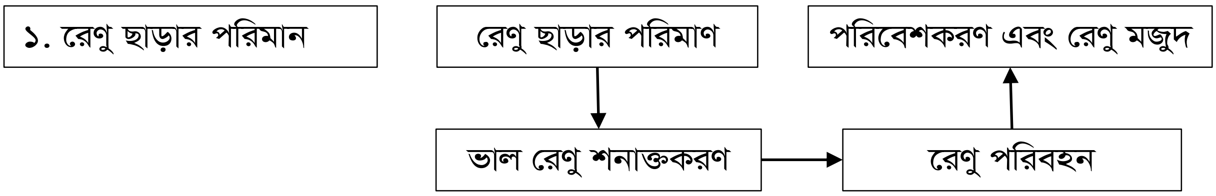

এক ধাপ পদ্ধতি ঃ

একই পুকুরে ২-৩ মাস রেণু ৫-১০ সেমি আকার পর্যন্ত লালন করা হয়। এ পদ্ধতিতে রুইজাতীয় মাছের যে কোনো প্রজাতির ৪-৫ দিন বয়সের রেণু প্রতি শতাংশে ৮-১০ গ্রাম ছাড়া যায়। সঠিক ব্যবস্থাপনায় রেণুর বাঁচার হার শতকরা ৫০-৬০%।

দুই ধাপ পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত নার্সারিতে ৪-৫ দিন বয়সের রেণু শতাংশ প্রতি ২৫-৩০ গ্রাম করে মজুদ করা যায়। প্রথমে অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুরে রেণু ছেড়ে এবং ১০-১২ দিন পর ধানী পোনা লালন পুকুরে স্থানান্তর করে ৬-৮ সপ্তাহ লালন করে ৭-১২ সেমি আকার চারা পোনা করা যায়। এ পদ্ধতি অধিক লাভজনক। সঠিক ব্যবস্থাপনায় ধানী পোনার বাঁচার হার শতকরা ৮০ ভাগ।

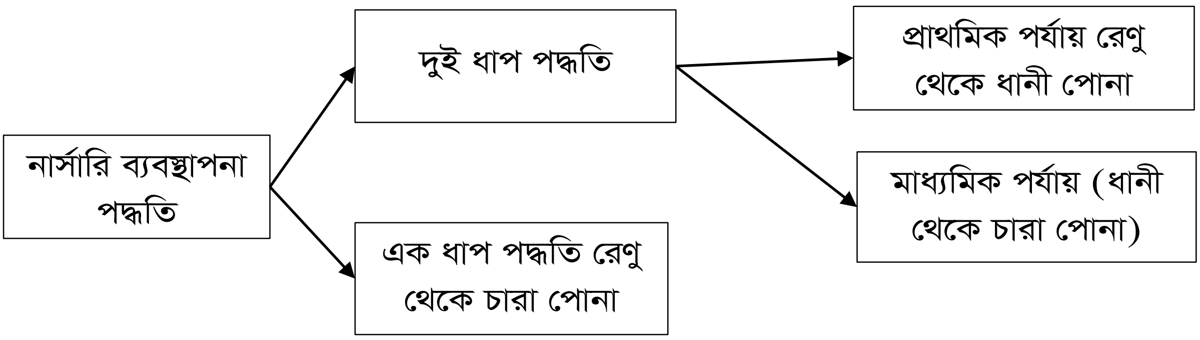

প্রজাতি অনুযায়ী গ্রাম প্রতি রেণুর সংখ্যা ঃ

প্রজাতি	রেণুর সংখ্যা / গ্রাম	প্রজাতি	রেণুর সংখ্যা / গ্রাম
কাতলা	৪০০টি		
রুই	৪৭৫টি		
মৃগেল	৪০০টি		

রেণু ছাড়ার পরিমাণ ঃ

প্রজাতি	এক ধাপ পদ্ধতি	দুই ধাপ পদ্ধতি
কাতলা	১০ গ্রাম/ শতাংশ	৩০ গ্রাম/ শতাংশ
রুই	৮ গ্রাম/ শতাংশ	২৫ গ্রাম/ শতাংশ
মৃগেল	১০ গ্রাম/ শতাংশ	৩০ গ্রাম/ শতাংশ

* একটি নার্সারি পুকুরে একই প্রজাতির রেণু চাষ করা ভাল। নার্সারি পুকুরে রেনু পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

- নার্সারি পুকুরের পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট করে নিয়ে সকালে সম্পূর্ণ পুকুরের তলায় মই দিতে হবে।
- রেনু পোনা মজুদের এক ঘন্টা আগে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রতি শতাংশে ৫-৭টি করে সম্পূর্ণ পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- রেনু মজুদ ঘনত্ব ঃ প্রতি শতাংশে ৪০-৬০ গ্রাম রেনু মজুদ করা যায়।
- রেনু পোনা খাপখাওয়ানো- রেনু ছাড়ার সময় পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। প্রথমে রেনুপোনা বহনকারী অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগের মুখ না খুলে পুকুরের পানিতে ১০-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুর থেকে হাতের তালুতে পানি নিয়ে ব্যাগের ভিতর ঝরণার মত করে পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ব্যাগের ভিতরের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান বা কাছাকাছি হয়ে গেলে ব্যাগটি হাল্কা কাত করে আস্তে ধীরে রেনু পোনা পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।
- রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম টিমসেন (৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া) প্রয়োগ করলে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনুপোনাগুলো রক্ষা পায়।

ভাল রেণু শনাক্তকরণ ঃ

রেণু প্রাপ্তির উৎস দুইটি যথা: প্রাকৃতিক এবং হ্যাচারি। বাহ্যিক ও অনুকূল পরিবেশে মাছের প্রজনন ঘটে বিধায় প্রাকৃতিক উৎসের রেণুর মান ভালো থাকে। তবে অসুবিধা হলো প্রয়োজনীয় সময়ে পরিমাণমত ইপ্সিত প্রজাতির রেণু না পাওয়া এবং এতে কাঙ্খিত ও অনাকাঙ্খিত রেণুর মিশ্রণ থেকে যায়। অন্যদিকে হ্যাচারির উৎপাদিত রেণু নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদিত হয়। ফলে পছন্দ ও চাহিদামত প্রজাতির রেণু সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ব্রুড মাছের গুণগত মান, পুষ্টি বজায় রাখা না হলে রেণুর গুণগত মান খারাপ হতে পারে।

ভাল রেণু চেনার উপায় ঃ

- চলাফেরায় সন্তরণশীল, দেহের রং কালচে-বাদামি / সবুজ
- রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায় এবং স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাতে সক্ষম।

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভাল রেণু	দুর্বল রেণু
দেহের রং	কালচে-বাদামি/সবুজ	ঘোলা, ফ্যাকাশে
আচরণ	চঞ্চল, দ্রুত সন্তরণশীল	অপেক্ষাকৃত ধীর, দুর্বল সন্তরণশীল
রেণুর পাত্রে হাত দেয়া	রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায়	রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায় না

রেণু পরিবহণ ঃ

হ্যাচারি থেকে অক্সিজেন ব্যাগে রেণু পরিবহণ করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে ব্যাগে যাতে কোনোভাবে ছিদ্র না হয় ব্যাগ ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে, বেশি ব্যাগ এক সাথে পরিবহন করা হলে বিকল্প অক্সিজেন সরবরাহ বা হাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৬০×৪০ সেমি আকারের একটি পলিথিন ব্যাগে ৮-১০ ঘন্টার দূরত্বে ১২৫ গ্রামের বেশি রেণু পরিবহন করা উচিত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য পরিমাণ হলো ৩-৫ গ্রাম/লিটার পানি।

খাপ খাওয়ানো ও পুকুরে রেণু ছাড়া ঃ

রেণুর ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা এনে রেণু ছাড়তে হবে। প্রথমে ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা এনে রেণু ছাড়তে হবে। এর জন্য রেণু পরিবহনকৃত ব্যাগটি ১০-১৫ মিনিট পুকুরে পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। ব্যাগের মুখ আস্তে আস্তে খুলে হাত একবার ব্যাগের পানিতে আবার পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে তাপমাত্রা সমান আছে কিনা দেখতে হবে। থার্মোমিটারও ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান না হলে উভয় পানি বদলা-বদলী করতে হবে। এভাবে তাপমাত্রার ব্যধান ধীরে ধীরে কমে আসবে। রেণু ছাড়ার জায়গায় হাত দিয়ে তলদেশের পানি উপরের দিকে আন্দোলিত করে তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে। তাপমাত্রার পার্থক্য যেন ২ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড এর বেশি না হয়। তাপমাত্রা সমতায় আসলে ব্যাগ কাত করে হালকা ঢেউ দিলে ব্যাগ থেকে রেণু ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। পাড়ের কাছাকাছি বাতাসের প্রতিকূলে রেণু ছাড়তে হবে। নার্সারি পুকুরে রেনু পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

- নার্সারি পুকুরের পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট করে নিয়ে সকালে সম্পূর্ণ পুকুরের তলায় মই দিতে হবে।
- রেনু পোনা মজুদের এক ঘন্টা আগে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রতি শতাংশে ৫-৭টি করে সম্পূর্ণ পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- রেনু মজুদ ঘনত্ব: প্রতি শতাংশে ৪০-৬০ গ্রাম রেনু মজুদ করা যায়।
- রেনু পোনা খাপখাওয়ানো- রেনু ছাড়ার সময় পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। প্রথমে রেনুপোনা বহনকারী অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগের মুখ না খুলে পুকুরের পানিতে ১০-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুর থেকে হাতের তালুতে পানি নিয়ে ব্যাগের ভিতর ঝরণার মত করে পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ব্যাগের ভিতরের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান বা কাছাকাছি হয়ে গেলে ব্যাগটি হাল্কা কাত করে আস্তে্র ধীরে রেনু পোনা পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।
- রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম টিমসেন (৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া) প্রয়োগ করলে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনু পোনা গুলো রক্ষা পায়।

রেণু ছাড়ার সময় ঃ

- সকালে অথবা বিকেল বেলা ছাড়াই উত্তম
- বৃষ্টি অথবা নিম্নচাপের দিনে রেণু ছাড়া ঠিক হবে না

রেণু ছাড়ার পর তিন দিন পর্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পানি অধিক সবুজ ও শেওলাযুক্ত হলে রৌদ্রজ্জল দিনে অধিক অক্সিজেন রেণুর মড়ক ঘটবে। এমতাবস্থায় পুকুরের তলার কাদা তুলে সারা পুকুরে ছিটাতে হবে যেন পানি ঘোলা হয়। এতে সূর্যের আলো বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফলে শেওলা সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে অধিক অক্সিজেন তৈরি করতে পারবে না।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ

পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে যে প্লাংকটন জন্মে, রেণু বা বড় পোনা তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া রেণু মজুদের পর প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

রেণু মজুদের পর ৪টি কাজ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

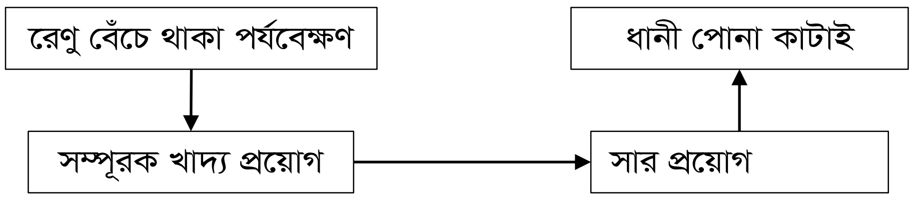

- প্রতিদিন ভোরে পুকুর পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- রেণু সাধারণত দল বেঁধে পুকুরের কিনার দিয়ে চলাফেরা করে, যা লক্ষ্য করলে খালি চোখেই দেখা যাবে।
- গামছা বা কাপড় টেনে প্রতি টানে যদি ৫-১০ রেণু আসে তবে বুঝতে হবে বেঁচে থাকার হার ভাল।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ ঃ

রেণুর জন্য পুকুরে সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভূসি খাবার হিসেবে ব্যহার করা যায়। এসব খাদ্যে প্রোটিন মান কম কিন্তু প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাবার তৈরিতে সহায়ক। খৈলের পরিবর্তে ফিসমিল ব্যবহার করা যায়। আবার খৈল (৩৫-৪০%) ভূসির (২০-২৫%) সাথে গবাদি পশুর রক্ত (৩৫-৪০%) মিশ্রণে সম্পূরক খাবার অত্যন্ত কার্যকর। এ মিশ্রণ প্রয়োগে রেণু থেকে ধানী পর্যন্ত বেঁচে থাকার হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ।

খাদ্যের পরিমাণ ঃ

খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের অবস্থা, রেণুর মোট ওজন, বয়স এবং তাপমাত্রার ওপর। সাধারণত রেণুর মোট ওজনের ২ গুণ হারে দৈনিক দু'বার খাবার দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ ঃ

১-৫ দিন মজুদকৃত রেণুর ওজনের ২ গুণ/ দিন

৬-১০ দিন মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৩ গুণ/ দিন

১১-১৫ দিন মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৪ গুণ/দিন

১৬-২০ দিন মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৫ গুণ/দিন

রেণু মজুদের প্রথম ৫ দিন শুধু খৈল প্রয়োগ সবচেয়ে ভাল। গবাদি পশুর রক্ত পাওয়া না গেলে খৈল ৫০ ভাগ ভূসি / কুড়া ৫০ ভাগ হারে ধান কাটাই না করা পর্যন্ত দিতে হবে। সরিষার খৈল অন্তত ১০ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে তার সাথে মিহি কুঁড়া/ ভূসি ভালোভাবে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ রেণু মজুদের পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন নিম্নহারে অজৈব সার দিতে হবে।

সার	পরিমাণ (গ্রাম / শতাংশ / দৈনিক
ইউরিয়া	৪-৫
টিএসপি	৩

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

অজৈব সার পুকুর প্রস্তুতকালীন পদ্ধতির অনুরূপ

রেণু মজুদের পর আরও সে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে;

- খুব সকালে রেণু ভেসে উঠতে পারে। তখন পানির ঝাপটা, সম্ভব হলে নতুন পানি দিতে হবে;
- সকালে ও বিকালে হররা টেনে তলার বিষাক্ত গ্যাস বের করে দিতে হবে;
- রেণু চাড়ার ৫-৭ দিনের মধ্যে চট জাল টানা যাবে না ও মেঘলা দিনে সার ও খাবার দেয়া যাবে না;
- অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে পানি গরম হয়ে গেলে ছায়া ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্ভব হলে ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে হবে।

ধানী পোনা কাটাই ঃ

রেণু পোনা আরো বড় হয়ে ধানের আকার বা ১.৫-২ সেমি এর বড় হলে তাদেরকে ধানী পোনা বলে। নিয়মিত সার ও খাবার দিলে ১০-১২ দিনের মধ্যেই ধানীপোনা কাটাই বা স্থানান্তর করা যায়।

- কাটাই পদ্ধতি ও সময়-সকাল বেলাতেই ধানী কাটাই করা ভালো। কাটাই করার আগের দিন পুকুরে জাল টেনে পোনাগুলেকে অল্প পানির ঝাপটা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। পরদিন সকলে জাল টেনে,

সতর্কতার সাথে পোনাগুলোকে একত্র করে বার বার পানির ঝাপটা দিতে হবে। তারপর অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বা পলিথিন ব্যাগে কম ঘনত্বে ধানী পোনা লালন পুকুরে স্থান্তর করা উচিত।

- ধানী থেকে চারা পোনা উৎপাদন- ধানী পোনা আরো বড় হয়ে হাতের আঙ্গুলের মতো বা আরো বড় আকার ধারণ করলে (৭ সেমি এর উপর, ওজন ৫-২৫ গ্রাম) তাদেরকে চারাপোনা বলে।
- পুকুর প্রস্তুতি - নার্সারি পুকুরের মত লালন পুকুরও এই নিয়মে তৈরি করা হয়। তবে কোন কীটনাশক ব্যবহারের দরকার নেই।

মজুদ ঘনত্ব এবং হার ঃ

- প্রতি শতাংশ ধানী মজুদ করা যাবে ৮০০-১০০০টি (একক বা মিশ্র)।
- একই পুকুরে এক জাতের অথবা বিভিন্ন জাতের ধানী একসাথে মজুদ করা যাবে।
- আলাদা আলাদা পুকুরে আলাদা আলাদা প্রজাতির ধানী মজুদ করা ভাল।

পোনা পরিবহন ও ছাড়া ঃ

- পলিথিন ব্যাগ, পাতিল বা ব্যারেলে ধানী পরিবহন করা যায়। পরিবহন ঘনত্ব নির্ভর করে পোনার প্রজাতি, শারীরিক অবস্থা, দূরত্ব এবং তাপমাত্রার ওপর।
- রেণু ছাড়ার মতোই পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে সহনশীল করে আস্তে আস্তে ধানী ছাড়তে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ ঃ

- প্রতিদিন পোনাকে তাদের ওজনের ৫-১০% হারে খাবার দেয়া উচিত;
- পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চালের মিহি কুঁড়া / গমের ভূসি ও খৈল ব্যবহার করা যায়;
- ভালো উৎপাদনের জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য দরকার, খাদ্যে প্রোটিন পরিমাণ ২৫-৩০% হলে ভাল হয়;
- রক্ত/ ফিসমিল ব্যয় সাধ্য। এগুলো না পাওয়া গেলে খৈল ৫০ ভাগ ও ভুসি ৫০ ভাগ হারে ব্যবহার করা যাবে;
- প্রতিদিন মোট খাবারের অর্ধেক সকালে এবং অবশিষ্ট বিকেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে;

ট্রেতে খাবার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
নার্সারী পুকুরে দৈনিক খাবার দেয়ার ন্য নিচের সরনীর নির্দেশনা অনুসরন করা যেতে পারে।

নার্সারী পুকুরে খাদ্য সরবরাহের তালিকা

দিন/রেণুর বয়স	রেণুর ওজন	খাদ্য	প্রয়োগ মাত্রা
১-৩ দিন	১০০ গ্রাম	আটা/ময়দা- ১০০ গ্রাম হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম- ১টি	৩ বারে প্রয়োগ, সকাল-৮.০০ টা, সন্ধ্যা-৬.০০টা ও রাত্রি ১০.০০ ঘটিকায়
৪-৭ দিন	১০০ গ্রাম	৩৫-৪০% প্রোটিন সমৃদ্ধ নার্সারী ফিড (পাউডার) ১০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
৮-১০ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ২০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
১৬-২১ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৪০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
২২-৩০ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৫০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা

সার প্রয়োগ ঃ নার্সারি পুকুরের মতো লালন পুকুরে নিয়মিত সার দিতে হবে। প্রয়োগ মাত্রা এবং পদ্ধতি নার্সারি পুকুরে সার প্রয়োগের মতোই, তবে পানিতে মাছের প্রাকতিক খাদ্যের অবস্থা অনুযায়ী সার কম বেশি হবে। পানির রং বেশি সবুজ হলে মেঘলা দিনে পুকুরে সার ও খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।

হররা টানা ঃ পোনা মজুদের পর মাঝে মাঝে সকালে / বিকেলে হররা টেনে দিলে পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস জমতে পারবে না।

নমুনায়ন ঃ ২-৩ সপ্তাহ পর পর জাল টেনে পোনার স্বাস্থ্য, ওজন এবং আনুমানিক বেঁচে থাকার হার পরীক্ষা করাসহ পোনার খাদ্য মাত্রার প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

অধিবেশন - ৬

তেলাপিয়া মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

৬.১ ভূমিকা ঃ

তেলপিয়া দ্রুত বর্ধনশীল সুস্বাদু মাছ। দেখতে আকর্ষণীয় এবং অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষ লাভজনক। এ মাছ একক, মিশ্র, সমন্বিত পেনে ও খাঁচায় চাষ করা যায় বলে বাংলাদেশে এর চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পাঁচ ধরণের তেলাপিয়া চাষ হয় যেমন- মোজাম্বিক তেলাপিয়া, নাইল তেলাপিয়া, লাল তেলাপিয়া, গিফ্‌ট তেলাপিয়া এবং মনোসেক্স তেলাপিয়া। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জাতের গিফ্‌ট তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষী ও খামারীদের কাছে এ মাছ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। গিফ্‌ট (GIFT) তেলাপিয়া থেকে উৎপাদিত এক লিঙ্গ পুরুষ (মনোসেক্স) তেলাপিয়া আরও দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় এর চাষ ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

৬.২ অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

- তেলাপিয়া মাছ সুস্বাদু এবং দেখতে আকর্ষণীয় হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই একে বৈশ্বিক মাছ বলা হয়;
- এ মাছ অধিক উৎপাদনশীল বলে চাষে অধিক লাভ হয়;
- সর্বভুক বিধায় মাছ চাষে উৎপাদন খরচ কম হয়;
- রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং প্রকৃতির বিরুপ পরিবেশে চাষ করা যায়;
- বেশি ঘনত্বে চাষ করা যায়;
- স্বাদু ও লবণাক্ত পানি ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের জলাশয়ে চাষ করা যায়; এবং
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ করা যায়- একক, মিশ্র, খাঁচায় ও পেনে চাষ করা যায়।

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ঃ তেলাপিয়ার সমস্ত শরীর আঁইশে ঢাকা। মাথা ছোট। পৃষ্ঠ পাখনা কাঁটাযুক্ত। বক্ষ পাখনা ছোট। একই বয়সের পুরুষ তেলাপিয়া স্ত্রী অপেক্ষা বড়। মোজাম্বিক তেলাপিয়া আকারে ছোট, রং ধুসর থেকে কালো। এর উৎপাদনশীলতা কম। নাইল তেলাপিয়া দেখতে ধুসর নীলাভ থেকে সাদা লালচে। পুরুষ মাছের গলার অংশে লালচে এবং স্ত্রী মাছের বর্ণ লালচে হলুদাভ। আকার আকৃতি অন্য সব তেলাপিয়ার মতই কিন্তু রং লাল এবং এর উৎপাদন কম বলে জনপ্রিয়তা পায়নি। গিফ্‌ট তেলাপিয়ার লেজের আড়াআড়ি রেখা সমূহ নিরবচ্ছিন্ন। নাইল তেলাপিয়ার গায়ের রং এর চেয়ে এটির গায়ের রং হালকা। মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছগুলি সম আকৃতির গিফ্‌ট তেলাপিয়ার মতো উচ্চ ফলনশীল ,তাপমাত্রার সহনশীল মাত্রা ১২-৩৫^{0} সে. ২-৮ পিপিএম অক্সিজেন এবং ৩-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় বাঁচতে পারে। মনোসেক্স তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল জাত্‌ এরা কম অক্সিজেন এবং বিস্তৃত তাপমাত্রায় খাপ খাওয়াতে সক্ষম।

আদি বাসস্থান ঃ তেলাপিয়ার আদি বাসস্থান আফ্রিকা। মোজাম্বিক তেলাপিয়ার উৎস আফ্রিকার মোজাম্বিক যা ১৯৫৪ সালে থাইল্যান্ড থেকে আনা হয়। নাইল তেলাপিয়ার উৎস আফ্রিকার নীল নদ। ১৯৭৪ সালে এই তেলাপিয়া থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। লাল তেলাপিয়া মূলতঃ তাইওয়ানের এলবিনো মোজাম্বিক এবং নাইলোটিকাস এর হাইব্রিড যা ১৯৮৮ সালে থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। গিফ্‌ট তেলাপিয়া ১৯৯৪ সালে বিএফআরআই ফিলিপাইন থেকে আমদানী করে। এটি নাইল তেলাপিয়ার উন্নত সংস্করণ।

চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ

পুকুর নির্বাচন ঃ মাছ চাষের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পুকুর। পুকুর নির্বাচরেন উপর তেলাপিয়ার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। পুকুর নির্বাচনে নীচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ঃ

- মাটি- যে কোন মাটির পুকুরে তেলাপিয়া চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ মাটি উত্তম;
- যে কোন আকারের পুকুরে তেলাপিয়ার চাষ করা যায়। তবে মজুদ পুকুর আয়তাকার হলে ভাল;
- আয়তন-যে কোন আয়তনের পুকুরে তেলাপিয়া চাষ করা যায়। তবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৫০-১০০ শতক মজুদ পুকুর উত্তম;
- গভীরতা ১-১.৫ মি. হলে ভাল। তবে অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হলে পুকুরের গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে;
- জাল টানা ও মাছ ধরার সুবিদার্থে পুকুরের তলা সমান হওয়া ভাল;
- তলার কাদার পরিমাণ কম হওয়া ভাল। এতে জাল টানা ও মাছ আহরণ সহজ হয়;
- পাড়ে ছায়া সৃষ্টিকারী কোন গাছ পালা না থাকা উত্তম;
- পাড় শক্ত ও উঁচু হলে বন্যার আশংকা কম থাকে;
- পানি নির্গমন ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়; এবং
- গভীর-অগভীর নলকুপের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা উত্তম।

পুকুর প্রস্তুতি ঃ

- পাড় মেরামত;
- পাড়ের ঢাল মেরামত;
- তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ;
- পুকুরের তলদেশ সমান করা; এবং
- পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডাল পালা ও পাড়ের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা;
- পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা সবচেয়ে উত্তম। এতে পুকুরের উৎাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পুকুর শুকানো না গেলে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়।
- **রোটেনন পাউডারঃ** ২০-৩০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য।
- **চা বীজের খৈলঃ** ১৪০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য।
- ব্লিচিং পাউডার- শতাংশ প্রতি ১৫-২০ গ্রাম
- ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে রোগ জীবাণু নির্মুল।

বিষাক্ততার মেয়াদ ৭-১০ দিন। ঐসময় পুকুরের পানি ব্যবহার ও গোসল নিষিদ্ধ।

- ব্লিচিং পাউডার অবশ্যই গুলে ছিটাতে হবে।
- খোলা ব্লিচিং পাউডার ক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

চুন প্রয়োগ ঃ তেলাপিয়ার পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রতিটি ধাপে এর প্রয়োগ অনিবার্য। পুকুরের মাটি ও পানির পিএইচ মান এবং রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পুকুর প্রস্তুতির ধাপে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ ঃ সাধারণত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (ফাইটোপ্লাংকটন) বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাথমিক উৎপাদকের (ফাইটোপ্লাংকটন) জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান-নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম (NPK) সরবরাহ করা যা জৈব ও অজৈব উৎস (সার) থেকে পাওয়া যায়। বর্ণিত উপাদানসমূহ শুকনো পুকুরের কাদা থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হয় বিধায় পুকুর শুকানোর পরে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শতাংশ প্রতি ২০০ গ্রাম চালে কুড়া, ১০০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ১ গ্রাম বেকারী ইষ্ট মিশিয়ে ইষ্ট মোলাশিস তৈরী করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, জৈব সারের উৎস হিসেবে গোবর অথবা মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ এগুলি মাছের রোগ বিস্তারের সহায়ক, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের অন্তরায়।

ইষ্ট মোলাশিস প্রস্তুত ও প্রয়োগঃ

- একটি পাত্র বা ড্রামে প্রয়োজনীয় চালের কুড়া, চিটা গুড় ও বেকারী ইষ্ট একত্রে মিশিয়ে পানি দিয়ে ডুবিয়ে রাখুন।
- ২৪ ঘন্টা পর উপরের স্বচ্ছ পানি পুকুরে ঢেলে দিন এবং সমপরিমাণ পানি দিয়ে ড্রাম ভরুন।
- পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা পর ড্রামের সমুদয় দ্রব্য (ইষ্ট মোলাশিস) পুকুরে প্রয়োগ করুন।

- খাদ্য নিরাপত্তার চেয়ে নিরাপদ খাদ্য বেশী জরুরী।
- পুকুরে গোবর ও হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠার ব্যবহার পরিহার করুন।

পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ঃ তেলাপিয়া চাষের জন্য বিশ্বস্থ উৎস হতে ভাল জাতের পোনা সংগ্রহ করতে হবে। সকল মনোসেক্স হ্যাচারির পোনা উৎপাদন মান সম্পন্ন নয়। পুকুর প্রস্তুতের সময় হতে পোনা সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করতে হবে। সাধারণতঃ হ্যাচারিসমূহ হতে ২১-২৪ দিন বয়সের ধানী পোনা সরবরাহ করা হয়। এ ধরণের পোনা সরাসরি বড় পুকুরে চাষ করলে পোনার মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে মজুদ পুকুরে চাষের সময়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় মাছের জীবভর (Biomass) বের করতে সমস্যা হয়। সেজন্য নার্সারী পুকুরে পোনা প্রতিপালন করে ১০-১৫ গ্রাম আকারের পোনা পুকুরে ছাড়া ভাল। পোনা মজুদের ২ দিন পূর্বে শতাংশ প্রতি ৪০০ গ্রাম জিওলাইট, ৫ মি.লি./মি.গ্রাম গ্যাস নিরোধক, ৩-৫ মি.গ্রাম জীবাণুনাশক প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও পোনা ছাড়ার ২-৩ ঘন্টা পূর্বে প্রতি শতাংশে ৩০ গ্রাম সোডিয়াম পারকার্বনেট প্রয়োগ করে পানি অক্সিজেন সমৃদ্ধ করা যায়।

- উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এরেটর/পানির ঝর্ণা দিয়ে অক্সিজেন বাড়িয়ে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া (Digestibility) বৃদ্ধি করুন। অন্যথায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পচন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পারে।
- খাদ্য গুদামের মেঝে শুকনা রাখুন।
- পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখুন।
- খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, তেলাপোকার নাগালের বাহিরে রাখুন।

মজুদ ঘনত্ব ঃ মজুদ পুকুরে পোনা ছাড়ার হার বা মজুদ ঘনত্ব নিম্নের বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীলঃ

- চাষির মাছ চাষের পূর্ব অভিজ্ঞতা;
- মাছ চাষের ধরণ- একক, মিশ্র, আধা নিবিড় বা নিবিড়;
- খাদ্যের ধরণ যেমনঃ ভেজা খাবার, পিলেট বা কারখানায় তৈরী ভাসমান খাবার;
- পুকুরের উৎপাদনশীলতা;
- চাষির সামর্থ;
- চাষের সময়কাল;

- চাষকালীন ব্যবস্থাপনা যেমন- পুকুরে নিয়মিত পানি পরিবর্তন, এরেটর ব্যবহার ইত্যাদি।
- আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ২০০-২৫০টি তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা যেতে পারে। এর সাথে কার্প জাতীয় মাছের পোনা ১৫-২০ টি এবং শিং মাছের পোনা ১৫-২০টি মজুদ করা যেতে পারে।

পোনা পরিবহণ ও শোধন ঃ তেলাপিয়া পোনা পরিবহণের সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পোনা ধরে পাকা চৌবাচ্চায় রেখে ৬-৮ ঘন্টা টেকসই করে পলিবাগে অক্সিজেন দিয়ে পরিবহন করতে হবে। মজুদ পুকুরে ছাড়ার জন্য পোনা একই আকারের (৫-৭ সে.মি.) হওয়া উচিত। সাধারণতঃ দিনের প্রথম এবং শেষ ভাগে পুকুরে পোনা মজুদ করা যেতে পারে। পোনা মজুদের সময় ১ পিপিএম লবণ গোলা পানিতে গোসল করিয়ে শোধন করিয়ে নেয়া ভাল। পোনা শোধনের পর পুকুরে পোনা ছাড়ার সময় পুকুরের পানিতে পোনাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

তেলাপিয়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ তেলাপিয়া চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তেলাপিয়া চাষ সম্পূর্ণরূপে সম্পূরক খাদ্য নির্ভর। একটি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের প্রায় ৬০% ব্যয় হয় মাছের খাদ্য ক্রয়ে। এক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, লাভজনকভাবে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্যের গুনাগুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেলাপিয়ার খাদ্যে ৩০-৩৫% আমিষ থাকা বাঞ্চনীয়।

খাবার প্রয়োগ ঃ মাছের দৈহিক ওজনের ১০% থেকে ৩% হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। মাছ ছোট অবস্থায় ৪ বার খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। মাছের গড় ওজন ২০ গ্রাম হলে দিনে ৩ বার খাদ্য প্রয়োগ করাই উত্তম। পিলেট খাবার পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানসমূহে ছিটিয়ে দিতে হবে। খাদ্য অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে এবং পরিমাণমত দিতে হবে। ভাসমান খাবার দেয়ার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ খাবার খাবে ঠিক সে পরিমাণ খাবার দিতে হবে অর্থাৎ মাছ যত সময় খাবার খাবে সে সময় পর্যন্ত খাবার দিতে হবে। এক্ষেত্রে এক সময়ে অনেক খাবার একবারে না দিয়ে পর্যায়ক্রমে দেয়া যেতে পারে। পোনা মজুদের পর ৩০-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ কৃত্রিম খাদ্য দৈহিক ওজনের ১০-৩% হারে নিম্নের ছক আনুযায়ী প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ

<table>
<tr><th>সপ্তাহ</th><th>খাদ্য প্রয়োগের হার</th><th>খাদ্যের প্রকার</th><td rowspan="9">• উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এরেটর/পানির ঝর্ণা দিয়ে অক্সিজেন বাড়িয়ে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া (Digestibility) বৃদ্ধি করুন। অন্যথায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পচন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পাারে।</td></tr>
<tr><td>১ম দুই সপ্তাহ</td><td>১০%</td><td>স্টার্টার-২</td></tr>
<tr><td>২য় দুই সপ্তাহ</td><td>৮%</td><td>স্টার্টার-৩</td></tr>
<tr><td>৩য় দুই সপ্তাহ</td><td>৭%</td><td>স্টার্টার-৩</td></tr>
<tr><td>৪র্থ দুই সপ্তাহ</td><td>৬%</td><td>স্টার্টার-৩</td></tr>
<tr><td>৫ম দুই সপ্তাহ</td><td>৫%</td><td>গ্রোয়ার-১</td></tr>
<tr><td>৬ষ্ট দুই সপ্তাহ</td><td>৪%</td><td>গ্রোয়ার-১</td></tr>
<tr><td>৭ম দুই সপ্তাহ</td><td>৪%</td><td>গ্রোয়ার-২</td></tr>
<tr><td>৮ম দুই সপ্তাহ</td><td>৩%</td><td>ফিনিশার-২</td></tr>
</table>

প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার নমুনায়ন করে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমান নির্ণয় করতে হবে। দৈনিক সকাল বিকেল দুবার খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তেলাপিয়ার রোগ ও প্রতিকার ঃ

তেলাপিয়া একটি উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মাছ। তবে উচ্চ মজুত ঘনত্ব ও বদ্ধ জলজ পরিবেশে পরিত্যক্ত খাবার, মাছের বিপাকীয় বর্জ্য ও অন্যান্য আবর্জনা পঁচনের ফলে পানি দূষিত হয়ে অনেক সময় রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। সাধারণত তেলাপিয়া প্রটোজোয়ান প্যারাসাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতাংশে ২০০-২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে। দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য আক্রান্ত মাছকে ১,০০০ লিটার পানিতে ২৫-৩০ মিলিমিটার ফরমালিন মিশিয়ে ৫-১০ মিনিট গোসল করাতে হবে। অনেক সময় তেলাপিয়া স্ট্রেপটোকক্কাস ও এরামোনাড সেপটিসেমিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এরূপ হলে ১-২ গ্রাম ইরাইথ্রোমাইসিন বা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রতি কেজি খাবারে মিশিয়ে ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে।

তেলাপিয়া চাষে কতিপয় সমস্যা ও প্রতিকার ঃ

ক. শীতের পীড়ন- ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে তীব্র শীতে (১০ডিগ্রি.সে.এর নীচে) তেলাপিয়ার খাদ্য গ্রহণ কমে যায়। ফলে দৈনিক কিছু কিছু মাছ মারা যেতে পারে।

প্রতিকার- গভীর-অগভীর নলকূপের পানি সরবরহ করে তাপমাত্রা বাড়িয়ে মৃত্যুহার কমানো যেতে পারে।

খ. পানি অতিরিক্ত সবুজ- অধিক ঘনত্বে তেলাপিয়া মজুদ করায় নিয়মিত আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের ফলে পানি দ্রুত গাঢ় সবুজ হয়ে মাছ মারা যেতে পারে।

প্রতিকার- শতক প্রতি ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করে এর প্রতিকার করা যেতে পারে।

গ. ধোঁড়া সাপ ও শিকারী পাখীর উপদ্রপ- তেলাপিয়া মাষ চাষের পুকুরে ঢোঁড়া সাপ ও পানকৌড়ি পাখী বড় শত্রু। ভাসমান খাবার প্রয়োগের সাথে সাথে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে তেলাপিয়া গোগ্রাসে খেতে থাকে তখন সুযোগ বুঝে ঢোঁড়া সাপ ও পানকৌড়ি ইচ্ছেমত তেলাপিয়ার পোনা খাওয়ার নেশায় মেতে ওঠে।

প্রতিকার ঃ

- পুকুরের উপর জালের ছাউনি দিয়ে অথবা রঙ্গিন পলিথিনের ফিতা টাঙ্গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে পানকৌড়ি নিবৃত করা যায়। এছাড়া এয়ারগান শুটিং করেও পানকৌড়ি নিবৃত করা যায়।
- কোঁচ বা টেটা দিয়ে ঢোঁড়া সাপ মেরে অথবা ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- পুকুর পাড়ের ইঁদুরের গর্ত বন্ধ এবং ঝোপঝাড় পরিস্কার রাখলেও সাপের উপদ্রপ কমানো যায়।

৫০ শতক পুকুরে তেলাপিয়া চাষের (এক ফসল) আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা/ পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট (টাকা)	মন্তব্য
১.	ইজারা মূল্য (৬ মাস)	৫০ শতক	২০০	১০,০০০/-	এলাকা ভেদে কম বেশী হতে পারে
২.	পুকুর সংস্কার ও প্রস্তুতি	৫০ শতক	থোক	২,০০০/-	-
৩.	চুন	৫০ কেজি	১৫/-	৭৫০/-	
৪.	**পোনা** ক) তেলাপিয়া (১০-১৫ সে.মি.) খ) রুই (১৫-২০ সে.মি.) গ) সিলভার কার্প (১০-১৫ সে.মি.) ঘ) কাতলা (১৫-২০ সে.মি.) ঙ) শিং (৫-৭ সে.মি.)	 ১২,৫০০টি ১০০টি ১০০টি ৫০টি ১০০০টি	 ১.৫০ ১০/- ৩/- ১০/- ২/-	 ১৮,৭৫০/- ১০০০/- ৩০০/- ৫০০/- ২০০০/-	-
৫.	কৃত্রিম খাদ্য (৩০% আমিষ FCR ১.৫)	২৮৪৬.৫ কেজি	৪০/-	১,১৩,৮৬০/-	-
৬.	ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি	থোক	থোক	১৫,০০০/-	-
৭.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	১০,০০০/-	-
৮.	**উপমোট ব্যয়**			**১,৭৪,১৬০/-**	
৯.	ব্যাংক ঋণের উপর ৮% সুদ			**১৩,৯৩২.৮০**	-
১০.	**সর্বমোট**			**১,৮৮,০৯২.৮০**	

উৎপাদন ও আয় ঃ

পোনার মজুদ সংখ্যা	মৃত্যু হার (আনুমানিক)	বেঁচে থাকা মাছের সংখ্যা	গড় ওজন (গ্রাম)	মোট ওজন কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
তেলাপিয়া- ১২,৫০০টি	১০%	১১,২৫০টি	২৫০	২৮১২.৫	৮০/-	২,২৫,০০০/-
রুই মাছ- ১০০টি	১০%	৯০টি	৫০০	৪৫	১৮০/-	৮,১০০/-
সিলভার কার্প-১০০টি	১০%	৯০টি	৫০০	৪৫	৬০/-	২,৭০০/-
কাতলা-৫০টি	৫%	২৫টি	৭৫০	১৮.৭৫	১৫০/-	২,৮১২.৫০
শিং -২০০০টি	১০%	১,৮০০টি	০.০২	৩৬	৩০০/-	১০,৮০০/-
সর্বমোট				**২,৯৫৭**		**২,৪৯,৪১২.৫**

নীট আয় ঃ আয় - ব্যয়= ২,৪৯,৪১২.৫ - ১,৮৮,০৯২.৮ = ৬১,৩১৯.৭

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর চাষের প্রভাব ঃ দেশে আধানিবিড় (Semi Intensive) ও নিবিড় (Intensive) পদ্ধতিতে তেলাপিয়া মাছের চাষ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর নিম্নলিখিত প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ঃ

১. পানি দূষণ- অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদের সাথে সাথে অতিরিক্ত খাদ্য ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের ফলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য রাসায়নিক অবশেষ এবং মৎস্য বর্জ্যের পচন ক্রিয়ায় পুকুরের পানিতে এ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বনডাইঅক্সাইড ইত্যাদি মিশে জলীয় পরিবেশের বিপর্যয় ঘটতে পারে।
২. মাছের খাদ্য হিসেবে প্রকৃতি থেকে শামুক, ঝিনুকের অতি আহরণের ফলে জলাশয়ের প্রতিবেশ (Ecosystem) বিঘ্নিত হতে পারে।
৩. ঔষধ, কীটনাশক ও বিষ এর যথেচ্ছা প্রয়োগের ফলে জীব বৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে।
৪. আধা নিবিড়/নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের পচনক্রিয়ায় পানি দুর্গন্ধযুক্ত হচ্ছে।
৫. অনেক খামারী ব্যয় সমন্বয়ের জন্য হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করে যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

অধিবেশন - ৭

গুলশা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

৭.১ ভূমিকা ঃ

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে গুলশা খুবই সুস্বাদু মাছ। এই মাছে কাটা কম। এ জন্য ছোট-বড় সকল বয়সের মানুষের কাছে এই মাছ জনপ্রিয়। গুলশার বাজারমূল্য বেশি বলে চাষিরা গুলশা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন হ্যাচারিতে এই মাছের পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের প্রায় সকল ধরণের পুকুর,দিঘি ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়। এক সময় দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে গুলশা মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে ধানক্ষেতে কীটনাশকের ব্যবহার, সেচের মাধ্যমে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ও অপরিমিত সার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় এ মাছের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ মাছটির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যায়।

গুলশা মাছের পুষ্টিমান ঃ

গুলশা মাছের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে নিম্ন

মাছের প্রজাতি	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	লৌহ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস (গ্রাম)
গুলশা মাছ	১৯.২	৬.৫	১.১	০.৩০	০.২৭	০.১৭

*** তথ্যসূত্র ঃ** প্রশিক্ষণ মডিউল, দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

গুলশা মাছের সাধারণ পরিচিতি ও জীববিদ্যা ঃ

গুলশা মাছ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের (Small Indigenous Species-SIS) এর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে বদ্ধ জলাশয়ে গুলশার চাষ হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক নাম - *Mystus Cavasius* (Hamilton)

স্থানীয় নাম - গুলশা ট্যাংরা।

ইংরেজি নাম - Gangetic Mystus

আবাসস্থল

গুলশা স্বাদু পানির মাছ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ইন্দো-চায়না, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, সিরিয়া ও পশ্চিম-আফ্রিকায় গুলশা মাছ বিস্তৃত। দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি জলাশয়ে এবং ধানক্ষেতে এই মাছ পাওয়া যায়। বর্তমানে বদ্ধ জলাশয় তথা পুকুর ও দিঘীতে গুলশা মাছের চাষ করা হচ্ছে। বিশেষতঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী, বৃহত্তর যশোর, বগুড়া অঞ্চলে গুলশা মাছ ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

- গুলশা মাছের দেহ আঁইশ-বিহীন, চকচকে, উজ্জ্বল রূপালী বর্ণ।
- দেহ মধ্যম আকৃতির চাপানো ও পিঠের অংশ বাঁকানো।
- মুখ তুলনামূলকভাবে ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়।
- গুলশা ক্যাটফিশ শ্রেণির মাছ। এর চার জোড়া গোঁফ আছে।
- পৃষ্ঠপাখনা ও বক্ষপাখনা লম্বা কাঁটাযুক্ত।
- পৃষ্ঠপাখনা থেকে লেজ পর্যন্ড় নরম মাংসল পৃষ্ঠপাখনা (adipose fin) রয়েছে।
- লেজ দুই ভাগে বিভক্ত।
- পরিপক্ক অবস্থায় গুলশার দৈর্ঘ্য ১৫-২৩ সে.মি.। স্ত্রী মাছ একই বয়সী পুরুষ মাছের তুলনায় আকারে বড়।
- গুলশা মাছ সর্বভুক।
- গুলশা মাছের প্রজনন মৌসুম বেশ দীর্ঘ (মধ্য ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর)। তবে এপ্রিল-আগস্ট মাস এই মাছের প্রজনন সর্বোত্তম মৌসুম।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস ঃ

- রেণু পোনার খাদ্য- হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জুও-প্যাংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম।
- ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্য- কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও-প্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।
- চারা পোনা থেকে বিক্রয়-উপযোগি গুলশার খাদ্য- কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচোচিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ।
- গুলশা সর্বভুক, বটম ফিডার (Bottom Feeder)। আর্টিফিসিয়াল ফিড দিয়ে বাণিজ্যিক চাষ করা যায়। যদিও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে এরা সরিষার খৈল, চালের কুড়া, ফিসমিল এরা খায়।
- নার্সারি পুকুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য
- গুলশা ট্যাংরা মাছ রাত্রে খাদ্য গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তবে শেষ বিকাল/সন্ধ্যা ও ভোর বেলাতেও খাদ্য খায়।

গুলশা মাছ চাষের সুবিধা ঃ

- গুলশা মাছ ছোট-মাঝারি-বড় বাৎসরিক/ষান্মাষিক/মৌসুমি ইত্যাদি প্রায় সব ধরণের পুকুরেই চাষ করা যায়।
- একক চাষের পাশাপাশি শিং-পাবদা-টেংরা-কার্পজাতীয় মাছের সাথেও মিশ্রচাষ করা যায়।
- চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি থাকায় এই মাছ চাষে বেশি আয় করা সম্ভব।
- চাষকালীন সময় (Culture Period) ছোট, ৪-৬ মাসেই বিক্রয় উপযোগী হয়।
- অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে পরিবহণ করে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়। ফলে অধিক মুনাফা হয়।
- পোনা ও অন্যান্য চাষ-উপকরণ সহজলভ্য।
- এ দেশের পরিবেশ ও জলবায়ু গুলশা চাষের উপযোগি।
- অবাঞ্ছিত মাছের পোনা খেয়ে পুকুর পরিষ্কার রাখে।
- গুলশা মাছের একক চাষ অপেক্ষা মিশ্রচাষে রোগ-বালাই কম হয়। ফলে দিন দিন এর মিশ্রচাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

গুলশা মাছ চাষের অসুবিধা ঃ

- গুলশা চাষ করতে অধিক মাত্রায় অক্সিজেন ৫-৭ মি.লি. গ্রাম/লিটার হারে চাষের পুকুরে প্রয়োজন।
- অধিক ঘনত্বে চাষ করার ক্ষেত্রে এরেটর/প্যাডেল হুইলের ব্যবস্থা রাখতে হয়। পুকুর পাড়ে বিদ্যুৎ বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হয়, যা প্রান্তিক চাষিদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য।
- গুলশা মাছকে রাত্রে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। পোনা এবং মাছ পর্যবেক্ষণও রাত্রে করতে হয় যা চাষির জন্য অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক।
- প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫-৭ মি.লি. গ্রাম/লিটার মাত্রার নীচে অক্সিজেন চলে আসলে মড়ক দেখা দেয়।

গুলশা মাছ চাষের পুকুরে উল্লেখযোগ্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী ঃ

- পিএইচ- পুকুরের পানির পিএইচ ৭.০-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে গুলশা মাছ চাষ করা যায়। তবে ৭.৫-৮.০ মাত্রার পিএইচ গুলশা ট্যাংরা চাষের জন্য উত্তম।
- পানির স্বচ্ছতা- ২৪-২৬ সে.মি. স্বচ্ছতার পানিতে গুলশা উৎপাদন ভালো হয়।
- খরতা (Hardness)- ৮০-২০০ মি.গ্রা/লিটার খরতা গুলশা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। পানির Hardness ২০-৩০ মি.গ্রা/লিটার থাকলে সহজে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হয়।
- তাপমাত্রা- ২৫-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গুলশা মাছ চাষের জন্য উত্তম।
- আয়রণ- পানিতে আয়রনের মাত্রা ০ - ১ পিপিএম এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। পানিতে ১ পিপিএম এর চেয়ে বেশি মাত্রার আয়রণ থাকা গুলশা মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকর।

মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা ঃ

পুকুর প্রস্তুতি ঃ

গুলশা, ট্যাংরা, পাবদা, শিং, মাগুর ইত্যাদি ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুর ও চাষের পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াসমূহ প্রায় একই রকম। পুকুর প্রস্তুতির ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-

- পুকুর শুকানো, তলদেশের কাদা জৈব অবশেষ অপসারণ।
- পাড় পরিষ্কার, মেরামত ও সংস্কার।
- গুলশা মাছের পুকুরে ১:২ ঢাল সর্বোত্তম।
- পুকুরের তলা মই দিয়ে সমান করে দেওয়া ভালো।
- পুকুরে পানি ঢুকানো ও বের করে দেওয়ার জন্য ইনলেট ও আউটলেট থাকা উত্তম। পুকুরের তলদেশ সংলগ্ন পানি ও উপরের স্তরে মৃত শ্যাওলাযুক্ত পানি বের করার জন্য পৃথক আউটলেটে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- পুকুরের পাড়ের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া দিয়ে সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ ইত্যাদি শিকারী সরীসৃপ সহ অন্যান্য প্রাণির অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ হ্রাস করা যায়। কাজেই গুলশা মাছের পুকুরের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া থাকা উত্তম।
- বাজ, পানকৌড়ি, বক ইত্যাদি শিকারী পাখির আক্রমণ থেকে গুলশা ট্যাংরা মাছকে রক্ষা করার জন্য পুকুরের উপরে নেটের ঢাকনি অথবা আড়াআড়িভাবে এক হাত পর পর প্লাস্টিকের ফিতা স্থাপন করা যেতে পারে।

- পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে রোটেনন প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়।
- পুকুরের পানি কমিয়ে ২-৩ ফুটে এনে ৯.১% শক্তিমাত্রার রোটেনন ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানিতে অথবা ৭% শক্তিমাত্রার রোটেনন ৩৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানিতে প্রয়োগ করতে হয়। বিষক্রিয়ার মেয়াদ ৫-৭ দিন।
- পুকুরে শামুক থাকলে তা দূর করা প্রয়োজন। কেননা শামুক বিভিন্ন রোগের জীবাণুর পোষক হিসাবে কাজ করে এবং পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে ভাগ বসায়।
- পুকুর প্রস্তুতির সময় শামুক দূর করার জন্য বি- চিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন সমৃদ্ধ) ২০০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট হারে অথবা তামাকের গুড়া ১-১.৫ কেজি/শতাংশ/ফুট হারে পুকুরের পানিতে প্রয়োগ করা যায়।
- ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ: শামুক দূর করার জন্য বি- চিং পাউডার ব্যবহার করা হলে পুনরায় পুকুর প্রস্তুতিতে বি- চিং পাউডার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। যদি কোন পুকুরে শামুক না থাকে তবে পুকুর প্রস্তুতির সময় প্রতি ৩৩ শতাংশে ৪-৫ কেজি বি- চিং পাউডার দিয়ে ৮-১০ দিন শুকিয়ে রোগ-জীবাণু মুক্ত করা উত্তম।
- ব্লিচিং পাউডার পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইপোক্লোরাস এসিড ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। এই হাইপোক্লোরাস এসিড ফ্রি র‌্যাডিক্যাল অক্সিজেন রিলিজ করে যা ক্ষতিকারক অনেক জীবাণু ও অন্যান্য অর্গানিজম বিনষ্ট করে।
- চুন প্রয়োগ- পুকুরের তলদেশের মাটি ও বিদ্যমান পানির pH অনুসারে চুন দিতে হয়। সাধারণত দো-আঁশ ও পলি-দো-আঁশ মাটির চেয়ে লাল মাটি, এটেল মাটি, কালচে কাদামাটি অধিক অম্লধর্মী হয়। অম্লধর্মী মাটির পুকুরে অধিক মাত্রায় চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মাছ চাষের পুকুরে পাথুরে চুন ($CaCO_3$) ব্যবহার করা ভালো। পুকুর প্রস্তুতির সময় বি- চিং পাউডার প্রয়োগের ২-৩ দিন পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- গুলশা মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির গভীরতা ৪-৬ ফুট হলে ভালো হয়।
- সার প্রয়োগ- খৈল - ১৫০-২০০ গ্রাম/শতাংশ
  ইউরিয়া - ৫০-৭০ গ্রাম/শতাংশ
  টিএসপি - ৫০-৭০ গ্রাম/শতাংশ
  এমপি - ২০-২৫ গ্রাম/শতাংশ
- যেসব পুকুরে খরতা (Hardness) ২০-৪০ mg/L ও pH অম্- ীয় থাকার ফলে প্রাকৃতিক খাদ্য সহজে উৎপাদন হয় না সেসব পুকুরে প্রতি শতাংশে ১-১.৫ কেজি জিপসাম/ডলোচুন প্রয়োগ করলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- পুকুরের খরতা (Hardness) ৪০-২০০ mg/L মাত্রায় থাকলে গুলশা ট্যাংরা মাছের পুকুর প্রস্তুতিতে সার ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

➢ গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। যদি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় তখন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে ঃ

নমুনা -১

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নির্যাসটুকু পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ঐ ছাকনিতে থাকা অবশিষ্ট পাদানগুলো ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করলে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয়।
চাউলের মিহি কুড়া	২০০ গ্রাম/শতাংশ	
চিটা গুড়	২০০ গ্রাম/শতাংশ	
ইস্ট	৫ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা -২

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
সরিষার খৈল	৭০গ্রাম/শতাংশ	
চিটাগুড়	৭০গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা -৩

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	একত্রে ৩ গুণ পানির মধ্যে মিশিয়ে দিতে হবে।
৩৫-৪০% প্রোটিনসমৃদ্ধ নার্সারী-১ফিড (পাউডার)	৩০০ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা -৪

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	আটা/ময়দা হালকা সিদ্ধ করে আঠালো অবস্থায় এনে এর সাথে পানি মিশিয়ে পুকুরে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করতে হবে
আটা/ময়দা	৫০ গ্রাম/শতাংশ	

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ঃ

সুস্থ-সবল পাবদা মাছের পোনার বৈশিষ্ট্য ঃ

➢ গাত্রাবরণ উজ্জ্বল ও চকচকে, পিঠের দিকে কালচে বর্ণের।
➢ স্রোতের বিপরীতে ঝাঁক বেঁধে দ্রুত চলাচলে সক্ষম।
➢ পোনার গা পিচ্ছিল।
➢ লেজ, বক্ষপাখনার কাঁটা ও অন্যান্য পাখনা অক্ষত থাকবে।
➢ গায়ে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন থাকবে না।
➢ অন্তঃপ্রজননমুক্ত পোনা।
➢ হাপা বা ট্যাংকে পানির উপরিস্তরে বিক্ষিপ্তভাবে যদি দু-একটি পোনাও খাড়াভাবে ভাসতে দেখা যায় এবং পোনার গা খসখসে ও গায়ের বর্ণ ফ্যাকাসে থাকে তাহলে ঐ হাপা বা ট্যাংক থেকে পোনা সংগ্রহ না করাই উচিৎ।

➢ বিকলাঙ্গ পোনা অন্তঃপ্রজননের সম্ভাবনা প্রকাশ করে। অন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন পোনার বৃদ্ধিহার কম হয় ও সহজে রোগ-বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই পোনা সংগ্রহের সময় ব্রুড মাছের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সতর্কতার সাথে সুস্থ পোনা সংগ্রহ করা উত্তম।

➢ পোনা পরিবহন ঃ

➢ গুলশা মাছের পোনা ড্রামে পরিবহণ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে চাষির পুকুর পর্যন্ড় পোনা পরিবহণ করাই উত্তম। ২-৪ সে.মি. আকারের পোনা অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে (৩৬´´ ×২২´´-২৪´) ব্যাগ প্রতি ১০০০টি হারে ৪-৬ ঘণ্টার দূরত্বে পরিবহণ করা যায়। পোনার আকার ৪-৫ সে.মি. হলে একই সময়ের দূরত্বে ৫০০টি পোনা একই আকারের ব্যাগে পরিবহণ করা যায়। গুলশার পোনা সাধারণত রাতে পরিবহণ করা ভালো। এ সময় পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকায় পোনার পরিবহণজনিত পীড়ন কম হয়। পলিথিন ব্যাগে ৪-৫ লিটার পানি নিয়ে প্রতি ২০ টি ব্যাগে ১০ গ্রাম অক্সিজেন পাউডার, ১ টি ওরস্যালাইন ও মাল্টিভিটামিন বা ভিটামিন সি ১০ গ্রাম হারে ব্যবহার করলে মাছগুলো সতেজ থাকে।

➢ হাপা বা ট্যাংক থেকে পোনা সংগ্রহ করা এবং ওজন কিংবা গণনা করার সময় প-াস্টিকের ঝুড়ি বা খসখসে পাত্রের পরিবর্তে স্টেইনলেস স্টিলের মসৃণ পাত্র ব্যবহার করা উচিৎ। কেননা, গুলশা মাছের দেহ আঁইশবিহীন ও নরম হওয়ায় প-াস্টিকের ঝুড়ি বা খসখসে পাত্র ব্যবহার করলে পোনার ত্বকে আঘাত লেগে সেকেন্ডারি ইনফেকশনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

➢ পোনা টেকসইকরণ- গুলশা মাছের পোনা পুকুরে মজুদের উদ্দেশ্যে পরিবহণের পূর্বেই টেকসই করে নিতে হয়। সরবরাহের উদ্দেশ্যে পোনা ধরার আগের শেষরাত্র থেকে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখা দরকার। আহরণকৃত পোনাগুলো ট্যাংক বা সিস্টার্নে ৮-১২ ঘণ্টা ঝরণাধারায় রেখে টেকসই করা যায়।

➢ মজুদ ঘনত্ব- গুলশা ট্যাংরা মাছ চাষের জন্য ৩-৫ সে.মি. আকারের বা ১৫০০-২০০০টি/কেজি আকারের পোনা মজুদ করা উত্তম। মজুদকৃত পোনাগুলো প্রায় সম-আকারের হওয়া উত্তম।

গুলশা মাছের পোনার মজুদ ঘনত্ব (প্রতি শতাংশে)-

প্রজাতি	**মডেল-১** (সংখ্যা)	**মডেল-২** (সংখ্যা)	**মডেল-৩** (সংখ্যা)	**মডেল-৪** (সংখ্যা)
গুলশা	১০০০-১২০০	৬০০-৭০০	৭০০-৮০০	৭০০-৮০০
পাবদা	-	৩০০-৪০০	-	২০০-২৫০
রুই	৩-৫	৮-১০	৮-১০	৮-১০
কাতলা	১-২	২-৩	২-৩	৫-৮
শিং	-	১৫০-২০০	৩০০-৪০০	১০০-২০০
টেংরা	৫০-১০০	-	-	-
মোট=	১০৫৪-১৩০৭	১০৬০-১৩১৩	১০১০-১২১৩	১০১৩-১২৬৮

➢ পুকুরে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে, পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে ও এ্যারেটর/প্যাডেল হুইল স্থাপন করে গুলশা ট্যাংরা মাছের মজুদ ঘনত্ব বৃদ্ধি করা যায়। গুলশা মাছের সাথে ১০-১২ টায় কেজি সাইজের রুই-কাতলা মজুদ করলে ৫-৬ মাসে রুই-কাতলার ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। মডেল-২ ও মডেল-৩ অনুসারে চাষ করার ক্ষেত্রে গুলশা ও শিং এর পোনা পাবদার পোনা মজুদের ৭-১০ দিন আগে মজুদ করা কিংবা একই সময়ে মজুদ করলে তুলনামূলকভাবে পাবদার পোনার চেয়ে বড় আকারের গুলশা বা শিং এর পোনা মজুদ করা প্রয়োজন।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (মডেল-১) ঃ

কেজিতে পোনার সংখ্যা	খাদ্য প্রয়োগের হার (দেহের ওজনের শতকরা)	খাদ্যের ধরণ	৩৩ শতাংশে ৩৩,০০০-৪০,০০০ টি মাছের জন্য সম্ভাব্য দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)
২০০০-২৫০০	৩০-৩৫	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৪.৫-৫.৫
১৫০০-২০০০	২৫-৩০	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৬-৭
৪৫০-৮০০	২০-২৫	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার) + নার্সারি -২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১২-১৪
৪৫০-৩০০	২০-১৫	নার্সারি -২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৫-১৮
৩০০-২২০	১৫-১২	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৭-২০
২২০-১৬০	১২-১০	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৯-২৩
১৬০-১১০	১০-৮	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট) + স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২২-২৬
১১০-৮০	৮-৭	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২৬-৩১
৮০-৬০	৭-৬	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট) + স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৩০-৩৭
৬০-৪৫	৬-৫	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৩৪-৪২
৪৫-৩০	৫-৪	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৪০-৪৮

- খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয়ের হিসাব: (২০০০+২৫০০)/২=২২৫০ টি মাছের ওজন ১ কেজি সুতরাং ৩৩,০০০টি মাছের ওজন= ৩৩,০০০/২২৫০ = ১৪ কেজি প্রায় এবং ৪০,০০০টি মাছের ওজন= ৪০,০০০/২২৫০ = ১৭ কেজি প্রায় ৩৩,০০০টি দৈহিক ওজনের তথা ১৪ কেজির (৩০-৩৫% এর গড়) ৩২.৫% হারে খাদ্য প্রয়োজন ৪.৫ কেজি প্রায়। একইভাবে ৪০,০০০টি দৈহিক ওজনের তথা ১৭ কেজির ৩২.৫% হারে খাদ্য প্রয়োজন ৫.৫ কেজি প্রায়।

- গুলশা মাছ নিশাচর। রাত্রে খাবার খেতে পছন্দ করে। তাই শেষ রাতে এবং সন্ধ্যা রাতে দৈনিক মোট দুইবার গুলশা পুকুরে খাবার দিতে হয়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (মডেল-২ ও মডেল-৩) ঃ

মডেল-২ ও মডেল-৩ ও মডেল-৪ এর ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রায় মডেল-১ এর মতই। তবে যেহেতু কার্প জাতীয় মাছের পরিমাণ মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪ এ তুলনামূলকভাবে মডেল-১ অপেক্ষা বেশি তাই সেক্ষেত্রে দুপুরে একবার কার্পজাতীয় মাছের দেহের ওজনের ২-৩% হারে ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

- পানির গুণাগুণ, মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে চাষী খাদ্য প্রদানের পরিমাণ কম-বেশি করতে পারেন।

- গুলশা চাষের পুকুরে নিয়মিত পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মাছের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পুকুরের পানির গুণাগুণ বজায় থাকে।

- খাদ্য প্রদানের সময় তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে (২০-৩০ মিনিট) আস্তেধীরে খাদ্য খাওয়ানো হলে মাছের বৃদ্ধি হারে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়।

- মাছের খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দিলে প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ৩ গ্রাম লেসিথিন সমৃদ্ধ খাদ্য (অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড) ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে। ৩-৪ মি.লি. ১-৩ ডি-গ-ুকাটন, পলিস্যাকারাইড, বিটেইন, বিটাগকাটন বা এই জাতীয় বাইন্ডার এবং হজমশক্তিবৃদ্ধিকারক অন্যান্য প্রোবায়োটিকসের সাথে লেসিথিন সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে খাদ্যের সাথে মাখিয়ে মাছকে খাওয়ালে খাদ্য গ্রহণে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যিক খাদ্য ছাড়াও চাষীবৃন্দ উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে গুলশা মাছ চাষে ব্যবহার করতে পারেন। নিচে সম্পূরক খাদ্য তৈরির একটি মডেল দেওয়া হলো ঃ

উপকরণ	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিশ মিল	২০	১২
মিট এন্ড বোন মিল	১৫	৭.৫
সয়াবিন মিল	১৫	৬
সরিষার/তিলের খৈল	১৫	৫.২৫
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৩০	৩.৬
আটা (গম)	৪.৮	০.৬
ভিটামিন ও খনিজ	০.২	-
	১০০	৩৫

- সম্পূরক খাদ্য তৈরির সময় চালের কুড়া, গমের ভূষি ও আটা সিদ্ধ করে ব্যবহার করলে এই খাদ্য উপকরণের হজমসাধ্যতা (digestibility)বৃদ্ধি পায়।
- বাণিজ্যিক খাদ্য (পিলেট) বা সম্পূরক খাদ্য (খৈল, কুড়া, ভূষি ইত্যাদি) মাছ চাষে ব্যবহার করলে পুকুরে এরেশনের ব্যবস্থা রাখা জরুরি।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

- গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির জন্য সার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কারণ সার ব্যবহারের কোন কারণে পানিতে ফাইটোপ- াংকটন ব- ুম সৃষ্টি হলে বা পুকুরে পানির স্বচ্ছতা ১৫-২০ সে.মি. তে থাকলে গুলশা ক্ষেত্রে অক্সিজেন স্বল্পতা পরিলক্ষিত হতে পারে।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- গুলশা ট্যাংরা মাছের চাষের ক্ষেত্রে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ বজায় রাখা জরুরি। পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখার জন্য নিয়মিত পানি পরিবর্তন করা দরকার।
- গুলশার পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ৪ পিপিএম এর কম হলেই গুলশা মাছ খাবি খেতে খেতে মারা যায়।
- দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫ পিপিএম এর চেয়ে কম থাকলে মাছের সাধারণ বৃদ্ধি ও খাদ্য গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে। দ্রবীভূত অক্সিজেন বৃদ্ধির জন্য প্রতি ৩৩ শতাংশে ০.৫ কেজি অক্সিজেন-পাউডার বা অক্সিজেন-ট্যাবলেট (হাইড্রোজেন পার অক্সাইড) প্রয়োগ করা যায়।
- পানিতে এমোনিয়া গ্যাসের প্রাদুর্ভাব (>০.০২৫ mg/L) পরিলক্ষিত হলে বা অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস (H_2S, CH_4,CO_2 ইত্যাদি) বৃদ্ধি পেলে ইউকা প্যান্ট এক্সট্রাক্ট সমৃদ্ধ গ্যাসনিবারক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োগমাত্রা ৩-৪ মি.লি/শতাংশ/৩-৪ ফুট গভীরতা। ইউকা প্যান্ট এক্সট্রাক্ট বাজারে সহজলভ্য না হলে ইউকা সমৃদ্ধ জিওলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। জিওলাইটের প্রয়োগমাত্রা ২০০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ/৩-৪ গভীরতা।
- পানিতে ফাইটোপ- াংকটনিক ব- ুম নিয়ন্ত্রণে গাজনকৃত সামুদ্রিক আগাছার নির্যাস (Farmented biomass of seaweed extract) ব্যবহার করা যায়। ৩-৪ ফুট গভীর পানির জন্য প্রয়োগমাত্রা একরপ্রতি ৩-৪ কেজি।
- পানির গুণাগুণ রক্ষায় প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রো-বায়োটিক উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা যায়। উপযুক্ত প্রো-বায়েটিক ব্যবহারের মাধ্যমে পানির এমোনিয়া, তলানির জৈব পচনজনিত গ্যাস, টিডিএস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে পানির পরিবেশ চাষ-উপযোগী রাখা যায়।
- গুলশা ট্যাংরা ক্ষেত্রে চাষিদেরকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ ট্যাবলেট বা পাউডার ও গ্যাস নিবারক সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ ঃ

- গুলশা মাছ সাধারণত ৪-৬ মাসে কেজিতে ৩৫-৪০ টি পর্যন্ত হয়ে যায়। এই সময়েই গুলশা মাছ বাজারজাত করা যায়।
- গুলশা মাছ জাল টেনে আহরণ করে পুরোপুরি ধরা যায় না । জাল টেনে মাছ কমানোর পর পুকুর সেচে আহরণ করতে হয়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করলে গুলশা মাছের বাজারমূল্য বেশি পাওয়া যায়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করার জন্য গুলশা মাছ আহরণের পর হাউজ বা ট্যাংকে ৮-১২ ঘণ্টা পানির ঝরণাধারায় রাখতে হয়।
- ১৬ইঞ্চি×৩০ইঞ্চি আকারের অক্সিজেনযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগে ৩৫-৪০ টি/কেজি আকারের গুলশা মাছ ব্যাগ প্রতি ১ কেজি হারে ৬-৭ ঘণ্টা জীবন্ড় পরিবহণ করা যায়।

রোগ-বালাই ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

- গুলশা ট্যাংরা মাছ চাষে কারিগরী সমস্যা ও সমাধান
- খাবি খাওয়া

লক্ষণ ঃ

- পানির উপরে ভেসে উঠে খাবি খায়।
- ক্লান্তভাবে পানির উপরিভাগে ঘোরাফেরা করে।
- পুকুরে শামুক ঝিনুক থাকলে কিনারে এসে জমা হয়।
- মৃতমাছ মুখ হা-করে থাকে এবং ফুলকা ফেটে যায়।

সমাধান ঃ

- গভীর নলকূপ বা পাম্পের সাহয্যে ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ পানি ঝরণার মত করে পুকুরে ফেলা।
- এ্যারেটর বা প্যাডেল হুইল চালানো।
- পানিতে সাঁতার কাটা, বাঁশ বা হাড়ি-পাতিল দিয়ে পানির উপরিভাগে আন্দোলন সৃষ্টি করা।
- খাবি খাওয়ার সময় হররা টানা যাবেনা। এতে অক্সিজেন শুন্যতা বেড়ে মাছের বেশী ক্ষতি হতে পারে।

অ্যামোনিয়াজনিত সমস্যা ঃ

পানিতে অনায়নিত অ্যামনিয়া ০.০২৫ মি.গ্রাম/লিটার মাত্রার চেয়ে বৃদ্ধি পেলে পানির রং কালচে ও তামাটে হয়। মাছ অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করে হঠাৎ মাথা ঘুরে মারা যায়। অনায়নিত অ্যামনিয়া মাছ চাষের জন্য অধিক ক্ষতিকারক।

অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ ঃ

- পুকুরের পানি পরিবর্তন করতে হয়।
- প্রতি ৩৩ শতাংশে ইউকা প- ান্ট এক্সট্রাক্ট সমৃদ্ধ গ্যাসনিবারক ১০০ মি.লি. পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পানির খরতা (Hardness) সমস্যা ঃ

পানিতে দ্রবীভূত বাই-কার্বনেট (HCO_3) ও কার্বনেট (CO_3)-এর ঘনত্বই হল ক্ষারকত্ব। এ বাই-কার্বনেট ও কার্বনেট অন্য কতগুলো উপাদনের সাথে একত্রে মিলিত আকারে থাকে। উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অন্যতম। এসব উপাদনের ঘনত্বকে খরতা (Hardness) এগুলোকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$)এর পরিমাণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রয়োজনীয় মাত্রায় খরতা (৮০-২০০মি.গ্রাম/লিটার) এর কম হলে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমানে হয় না ও পুষ্টি উপাদানের অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়।

খরতা বৃদ্ধির উপায় ঃ

- মাটি ও পানির pH প্রয়োজনীয় মাত্রায় নিয়ে আসার জন্য পরিমিত চুন ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- পুকুরে তুষের ছাই ৩-৫ কেজি প্রতি শতাংশে ব্যবহার করে ক্ষরতা বৃদ্ধি করা যায়।
- পুকুরে খরতা (Hardness) ২০-৪০ mg/L মাত্রায় থাকলে প্রতি শতাংশে ১.০-১.৫ কেজি জিপসাম/ডলোচুন প্রয়োগ করলে খরতা বৃদ্ধি পায়।
- পানির উপর সবুজ স্তর সমস্যা

পুকুরে পানির রং গাঢ় সবুজ হয়ে গেলে বা পানির উপর শ্যাওলার স্তর পড়লে অতিরিক্ত শ্যাওলা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

সবুজ স্তর নিয়ন্ত্রণ ঃ

- ৩-৪ ফুট গভীরতার পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন ব- ুম নিয়ন্ত্রণে Farmented biomass of seaweed extract ৩-৪ কেজি/একর হারে ব্যবহার করা যায়।
- পানি পরিবর্তন বিশেষত: উপরের স্ড়র রের শ্যাওলাগুলো পাইপের মাধ্যমে বের করে দেওয়া প্রয়োজন।

পানির ঘোলাত্ব ঃ

পুকুরে ভাসমান পদার্থ বা ক্ষুদ্র মাটি কণার জন্য অত্যাধিক ঘোলায় মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটলে প্রতি শতকে ৮০-১৬০ গ্রাম হারে এ্যালুমিনিয়াম সালফেট বা ফিটকিরি পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। অম্ল/লাল মাটির কারণে ঘোলাত্ব সৃষ্টি হলে চুন প্রয়োজনীয় মাত্রায় দিয়ে ঘোলাত্ব দূর করতে হবে। এছাড়া তুষের ছাই প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি হারে ব্যবহার করেও অধিক ঘোলাত্ব দূর করা যায়।

পাখনা ও লেজ পচা রোগ ঃ

- গুলশা ট্যাংরা মাছের পাখনা ও লেজ পচা রোগ হলে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (OTC) গ্রুপের লিকুইড এন্টিবায়োটিক ২০০ মিলি/৩৩ শতাংশ (৩-৫ ফুট পানিতে) পর পর ৩দিন প্রয়োগ করতে হবে (এন্টিবায়োটিক উইথড্রয়াল পিরিয়ড ২১দিন)।
- আক্রান্ত মাছের খাদ্য গ্রহণে অনীহা থাকায় ঙঞঈ খাবারের সাথে মিশিয়ে না দিয়ে পানিতে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- ব্লিচিং পাউডার ৮-১০ গ্রাম/ শতাংশ হারে পুকুরে প্রয়োগ করলে তা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে ও পুকুরে পরিবেশ উন্নয়ন করে।
- গুলগুলশা মাছের ব্যাকটেরিয়াজনিত ক্ষত রোগ

লক্ষণ:

- বক্ষ পাখনা, পিঠ ও পেট অঞ্চলে গুলশা মাছের লালচে ক্ষত দেখা যায়।
- বারবেল ক্ষয় পেতে থাকে ও এক পর্যায়ে খসে যায়।
- চোখেও লালচে ক্ষত দেখা যায়।
- লেজের দিকে লাল লাল র‍্যাশ দেখা যায়।

রোগ সৃষ্টির কারণ ঃ

এ্যারোমোনাস ও মিক্সোব্যাকটার গ্রুপের ব্যাকটেরিয়াসমূহ এই রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

প্রতিকার ঃ

- ব্লিচিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন সমৃদ্ধ) ১০-১২ গ্রাম/শতাংশ/৩-৪ ফুট পুকুরে প্রয়োগ করা যায়।
- ক্ষত দূরীকরণে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (OTC) গ্রুপের পাউডার ৩-৫ গ্রাম প্রতি কেজি খাদ্যে ৩-৫ দিন ব্যবহার করা যায় অথবা উপযুক্ত এন্টিবায়োটিক প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা যায় (এন্টিবায়োটিক উইথড্রয়াল পিরিয়ড ২১দিন)।
- ভিটামিনের অভাব এবং অপুষ্টিজনিত রোগ

রোগের লক্ষণ ও কারণ ঃ

ক) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এ, ডি এবং কে-এর অভাবজনিত কারণে মাছের অন্ধত্ব এবং হাড় বাঁকা রোগ দেখা দেয়।

খ) ভিটামিন বি-এর অভাবে মাছের ক্ষুধামন্দা, স্নায়ু দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা এবং ত্বক ও ফুলকার উপর ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

গ) এছাড়া মাছের খাবারে হজমযোগ্য আমিষের অভাবে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এতে মাছ পীড়িত ও অস্থির বোধ করে এবং অচিরেই রোগাক্রান্ড় হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা ঃ

- প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ২-৩ গ্রাম হারে ৫-৭ দিন মাল্টিভিটামিন খাওয়ানো যেতে পারে।
- গুলশা মাছের ভাইরাসজনিত রোগ

লক্ষণ ঃ

- গুলশা মাছ ভাইরাসে আক্রান্ড় হলে সম্পূর্ণ পুকুরে মারাত্মকভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে যায় ও দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটে। এ ধরণের সংক্রমণে সাধারণত বিশেষ বহ্যিক কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

প্রতিরোধ ঃ

ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধে পুকুরের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। পুকুরের পাড় পরিষ্কার রাখতে হবে। পুকুরের কোন অবস্থাতেই ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না, মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে না। পুকুরে কোন প্রাণি বা পাখির বিষ্ঠা ব্যবহার করা যাবে না। রোগের যাবতীয় বাহক যেমন: বাইরের মাছ, মানুষ, গরু, ছাগল, পাখি, পোকা-মাকড়, কাঁকড়া, সাপ, ব্যঙ ইত্যাদির দ্বারা রোগ যেন ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। পুকুরের সাথে নদী-নালা, খাল-বিল বা কোন নর্দমার সংযোগ দেওয়া যাবে না। পরিমিত ও সুষম খাদ্য ব্যবহার করতে হবে। প্রতি ১৫-২০ দিন পর পর জীবাণুনাশক ও জিওলাইট ব্যবহার করে পুকুরের পানির পরিবেশ ভালো রাখতে হবে। সঠিক মজুদ ঘনত্ব বজায় রেখে মাছকে পীড়নমুক্ত রাখতে হবে।

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

৩৩ শতাংশ পুকুরে চাষের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়-

- পুকুর প্রস্তুতি ঃ

১.	পুকুর সেচ ও সংস্কার-	২,০০০/-
২.	তলার কাদা অপসারণ ও পাড় মেরামত-	২,০০০/-
৩.	পাড়ে নাইলন নেটের বেড়া ও প্লাস্টিক ফিতা বাবদ ব্যয়-	২,০০০/-
৪.	চুন,বি- চিং পাউডার ও অন্যান্য-	১,০০০/-
	উপমোট=	**৭,০০০/-**

➢ পোনা ক্রয়- ৪০,০০০ টি পোনা (পরিবহণ সহ)-	**৩০,০০০/-**
➢ খাদ্য বাবদ ব্যয় (৪০,০০০ টি মাছের হিসাবে)-	**১,৫০,০০০/-**
➢ পানি ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয়-	**১০,০০০/-**
➢ ঔষধ ও অন্যান্য বাবদ ব্যয়-	**৮,০০০/-**
➢ আহরণ ও বাজারজাতকরণ বাবদ ব্যয়-	**১০,০০০/-**
সর্বমোট ব্যয়-	**২,১৪,০০০/-**

৩৩ শতাংশ পুকুরে ৪০,০০০ টি মাছ চাষ থেকে সম্ভাব্য আয়-

মোট উৎপাদন- মডেল-১ অনুযায়ী ৪০,০০০ টি গুলশা মাছের ১০% মৃত্যুহার বিবেচনা করলে ৩৬,০০০ টি মাছ ১ কেজিতে ৪০টা হিসাবে মোট উৎপাদন হয় প্রায় ৯০০ কেজি। রুই ও কাতলা মাছের মোট উৎপাদন ৭×৩৩×১=২৩১ কেজি।

মোট আয়- প্রতি কেজি গুলশা ৪৫০/- দরে ৯০০ কেজির মূল্য-	**৪,০৫,০০০/-**
প্রতি কেজি রুই-কাতলা ১২০/- দওে ২৩১ কেজির মূল্য-	**২৭,৭২০/-**
সর্বমোট আয়-	**৪,৩২,৭২০/-**
মুনাফা-	**২,১৮,৭২০/-**

- মডেল-১ অনুসারে ২৩০০ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করে প্রায় ১১৩১ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে FCR ২:১ ধরে হিসাব করা হয়েছে।

রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

গুলশা মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুতি, পোনা সংগ্রহ, খাদ্য প্রয়োগ, ঔষধ প্রয়োগ, নমুনায়ন, আহরণ, বাজারজাতকরণ সহ প্রতিটি ধাপের রেকর্ড লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice) এর জন্য অপরিহার্য।একটি রেকর্ড বইয়ে চাষীর নাম, ঠিকানা, পুকুরের অবস্থা, আয়তন ও বৈশিষ্ট, চুন, সার, বিষ প্রয়োগের মাত্রা, মজুতসংখ্যা, আকার, মজুদের তারিখ, চাষকালীন সার ও খাদ্য প্রয়োগের তারিখ ও মাত্রা, ক্রয়মূল্য ও মাছের শারীরিক বৃদ্ধির হার, আহরণ ও বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি তথ্য নিয়মিত লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এসব লিখিত তথ্য সংরক্ষণ করলে তা যুগপতভাবে চাষীর ভবিষ্যত চাষের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগমন ঘটাতে সহায়তা করবে এবং সম্প্রসারণকর্মী/পরামর্শদাতা/বিশেষজ্ঞবৃন্দকেও সঠিক পরামর্শ প্রদানে সহায়তা করবে।

- হাঁসপোকা সহ ক্ষতিকারক পোকা দমন- নার্সারি পুকুরে রেনু অবমুক্ত করার ৫৬-৭২ ঘন্টা পূর্বে ৩-৪ ফুট গভীরতার জন্য ডেলিটিক্স/এনগ্রেভ ০.৫ মি.লি./শতাংশ হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- নার্সারি পুকুরে রেনু পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা
- নার্সারি পুকুরের পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট করে নিয়ে সকালে সম্পূর্ণ পুকুরের তলায় মই দিতে হবে।
- রেনু পোনা মজুদের এক ঘন্টা আগে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রতি শতাংশে ৫-৭টি করে সম্পূর্ণ পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- রেনু মজুদঘনত্ব: প্রতি শতাংশে ৪০-৬০ গ্রাম রেনু মজুদ করা যায়।
- রেনু পোনা খাপখাওয়ানো- রেনু ছাড়ার সময় পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। প্রথমে রেনুপোনা বহনকারী অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগের মুখ না খুলে পুকুরের পানিতে ১০-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুর থেকে হাতের তালুতে পানি নিয়ে ব্যাগের ভিতর ঝরণার মত করে পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ব্যাগের ভিতরের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান বা কাছাকাছি হয়ে গেলে ব্যাগটি হাল্কা কাত করে আস্তে্ড় ধীরে রেনু পোনা পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।
- রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম টিমসেন (৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া) প্রয়োগ করলে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনুপোনাগুলো রক্ষা পায়।
- নার্সারি পুকুরে খাদ্য ব্যবস্থাপনা

টিপ্স -১১: মই দেওয়ার সময় যদি গ্যাসের আধিক্য পরিলক্ষিত হয় তাহলে ৩৩ শতাংশে বায়ো-একুয়া ৫০: ১০০ মি.লি. বা গ্যাসোনেক্স প্লাস ১০০ গ্রাম বা এমোনিল ৫০-৭০ গ্রাম হারে ব্যবহার করতে হবে। গুলো ছাড়াও বাজারে গ্যাস দূর করার অন্যান্য রাসায়নিকের সহজপ্রাপ্যতা রয়েছে।

টিপ্স -১২: টিমসেন স্প্রে করে প্রয়োগ করলে হাতে ছিটানোর চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

নার্সারী পুকুরে খাদ্য সরবরাহের তালিকা

দিন/রেণুর বয়স	রেণুর ওজন	খাদ্য	প্রয়োগ মাত্রা
১-৩ দিন	১০০ গ্রাম	আটা/ময়দা- ১০০ গ্রাম হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম- ১টি	৩ বারে প্রয়োগ, সকাল-৮.০০ টা, সন্ধ্যা-৬.০০টা ও রাত্রি ১০.০০ ঘটিকায়
৪-৭ দিন	১০০ গ্রাম	৩৫-৪০% প্রোটিন সমৃদ্ধ নার্সারী ফিড (পাউডার) ১০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
৮-১০ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ২০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
১৬-২১ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৪০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
২২-৩০ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৫০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা

টিপ্স -১৭: মুরগীর ডিমের কুসুম পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায়, দানাদার কম থাকে। অন্যদিকে হাঁসের ডিমের কুসুম পানিতে গুলানোর পরও পাবদা মাছের রেনুর খাওয়ার উপযোগী দানাদানা খাদ্যকণা অবস্থায় থাকে।

টিপ্স -১৮: প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পাবদা রেনু/পোনা খাদ্য তুলনামূলকভাবে কম গ্রহণ করে।

অধিবেশন - ৮

শিং মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশে বিগত কয়েক দশক ধরে রুই জাতীয় মাছ ও কয়েকটি বিদেশা প্রজাতির মাছ পরিকল্পিতভাবে চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাছ চাষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে এবং গ্রামিণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ দেশে নানা প্রজাতির ছোট-বড় মাছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একসময় এখানকার প্রাকৃতিক জলাশয়ে সকল ধরণের মাছের ব্যাপক প্রাচুর্যতা ছিল। ছোট প্রজাতির মাছের মধ্যে কৈ, শিং, মাগুর, টেংরা, পাবদা সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় সুস্বাদু মাছ হিসাবে সমাদৃত। কিন্তু প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুস্বাদু ছোট আকারের নানা প্রজাতির মাছ আর আগের মত পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক জলাশয়ে অন্যান্য ছেট প্রজাতির মাছের ন্যায় শিং মাছের প্রাচুর্যতা ক্রমহ্রাসমান। কিন্তু দেশের প্রাণিজ আমিষের তথা পুষ্টি চাহিদা পূরণে এধরনের ছোট মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। শিং মাছ অত্যন্ত পুষ্টি সম্মৃদ্ধ মাছ। স্বাদ ও পুষ্টিগুণ বিবেচনায় শিং মাছের গ্রহণ যোগ্যতা এবং গুরুত্ব অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি। এ মাছের ব্যাপক বাজার চাহিদা রয়েছে। এ পেক্ষাপটে শিং মাছ আমাদের চাষ ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এ মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন ৯০ দশকে সফল হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এ মাছ চাষের ব্যাপক সম্পসারণ ঘটেছে। ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর, নরসিংদী জেলার হ্যাচারিতে পর্যাপ্ত পোনা উৎপাদন হচ্ছে এবং অত্যন্ত লাভ জনকভাবে এ মাছের চাষ হচ্ছে। এ মাছ চাষ অধিক লাভজনক হওয়ায় এ মাছের চাষ দ্রুত সম্পসারণ হচ্ছে। এ মাছের চাষ সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য চাষ ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি জানা একান্ত প্রয়োজন।

৮.১ শিং মাছ চাষের সুবিধা ও গুরুত্ব ঃ

আমাদের দেশেরে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাছের ভূমিকা অপরিসীম। সে কারণে কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি শিং মাছসহ অন্যান্য মাছের বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আরো যে সব কারণে শিং মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

- বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলাবায়ু এ মাছ চাষে অত্যন্ত উপযোগী।
- ছোট-বড় সকল জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়।
- মৌসুমি, বাৎসরিক ও অগভীর জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়।
- অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গ থাকায় এমাছ বাতাস হতে অক্সিজেন নিয়ে অনেক সময় ধরে বেচে থাকতে পারে।
- অধিক ঘনত্বে একক ও মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা যায়।
- বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে এমাছ চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়।
- এ মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু, এর বাজার চাহিদা এবং বাজার মূল্য অনেক বেশি।
- অসুষ্থ্য ও রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রোগীর পথ্য হিসেবে এমাছ সমাদৃত।
- এ মাছে কম রোগ বালাই হয় এবং এ মাছের পরিবেশ তারতম্য সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি।
- শিং মাছ ৪-৭ মাস চাষে খাবার উপযোগী ও বাজারজাতকরণ করা যায়।
- জীবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাজারজাত করা যায় ফলে নিশ্চিতভাবে উত্তম মূল্য পাওয়া যায়।
- চাষ পদ্ধতিও সহজ এবং সাধারণ সম্পূরক খাবার খেয়েই দ্রুত বড় হয়।
- আধা নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।
- মাছটি রাক্ষুসে নয় বলে অন্য প্রজাতি মাছের সাথে মিশ্র চাষ করা যায়।

৮.২ শিং মাছ চাষ পদ্ধতি ঃ

শিং মাছের পরীক্ষামূলক চাষ প্রাথমিকভাবে পাংগাসের সাথি ফসল হিসাবে শুরু হয়। এ ধারাবাহিকতায় এমাছের বাণিজ্যিকভাবে চাষ-আবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ময়মনসিংহে এমাছের পোনা উৎপাদন শুরু হলেও বর্তমানে বগুড়া, যশোর, নরসিংদী জেলায় এমাছের পোনা উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং এমাছ চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। অনেক এলাকার ৬০-৭০% পুকুরে ভিন্ন ভিন্ন আংগিকে হলেও শিং মাছের চাষ হচ্ছে বেশ লাভজনকভাবে। চাষ লাভজনক হওয়ায় প্রতিনিয়ত এমাছ চাষের পুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল চাষের পুকুরের সংখ্যায় যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়, চাষের নিবিড়তাও (Intensification) বাড়ছে। উন্নত মানের খাদ্যের সরবরাহ সহজ লভ্য হওয়া এ মাছ চাষের সম্প্রসারণে সয়াক ভূমিকা রাখছে। এ মাছের পোনা উৎপাদন পদ্ধতিও বেশ সহজ হওয়ায় বেসরকারী পর্যায়ে স্থানীয় হ্যাচারি মালিকগণ পর্যাপ্ত পরিমাণে পোনা মাছ উৎপাদন করে এ মাছ চাষে বিশাল ভূমিকা রাখছে। পোনার সহজ প্রাপ্যতা, চাষের পদ্ধতি, উচ্চ বাজার মূল্য সর্বোপরী এ প্রজাতির জৈব বৈশিষ্ঠ্য (Biological Character) বিবেচনা করে শিং মাছ চাষের অর্থনৈতিক সুবিধা অনেক।

৮.৩ পুকুর নির্বাচন ঃ

মাছ চাষের জন্য প্রথমে যা প্রয়োজন তা হল পুকুর। পুকুর নির্বাচনের উপর শিং মাছ চাষের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। লাভজনকভাবে শিং মাছ চাষ করতে হলে পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মাছ চাষের পুকুর নির্বাচনের ন্যায় নীচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ঃ

- পুকুর আয়তাকার এবং পুকুরের তলদেশ এক দিকে ঢালু হলে ভাল হয়।
- পুকুর যে কোন আকারের হতে পারে। তবে বাণিজ্যিক চাষের জন্য বা ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য ৫০-১০০শতাংশ হওয়া ভাল। বেশি বড় আকারের পুকুর হলে খাদ্য প্রদান এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থানায় সমস্যা হয়।
- পুকরের গভীরতা ১.৫ -২.০ মি., পুকরের ঢাল ১ঃ১.৫ থেকে ১ঃ২ অনুপাতে হলে ভাল হয়।
- মাটির গঠন দোআঁশ/ বেলে দোআঁশ হওয়া উত্তম।
- পুকুরের দৈনিক সূর্যালোকের মেয়াদ কাল ৬-৮ ঘন্টা হলে ভাল হয়।
- পাড়ে ছায়া প্রদানকারী বড় গাছ বা ঝোঁপ ঝাড় না থাকায় ভাল।
- পুকুরটি বণ্যামুক্ত উচু পাড় বিশিষ্ঠ হলে ভাল হয়।
- পুকুরটিতে প্রয়োজনে পানি দেবার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।
- অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের সুবিধা থাকলে ভাল হয়।
- পুকরের সাথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে খাদ্য, মাছ পরিবহন সুবিধা হয়।
- ব্যাস্থাপনার সুবিধার জন্য পুকুরের অবস্থান বাড়ির কাছাকাছি হলে ভাল হয়।

চাষের সময় কাল ঃ

চাষির নিজস্ব নার্সারিতে পোনা মজুদ থাকলে শীতের পরে মার্চ মাসের শুরুতেই পোনা মজুদ করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লালন পালন করলে মাছের গড় ওজন ৭০ গ্রাম হয়ে যায়। আবার নতুন পোনার প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে চাষি মে মাসে এ মাছের পোনা মজুদ করলে বাজার দরের উপর নির্ভর করে শীতের পরে মার্চ মাসের শেষে বিক্রয় এর জন্য রেখে দেয়া যেতে পারে। শীতের কয়েক মাস মাছ কে সাধারণত কম খাবার দিতে হয়। যে সব পুকুরে শীতের সময় পর্যাপ্ত রৌদ্রপড়ে বা গভীর নলকুপের পানি নিয়মিত সরবরাহ করা হয় সে সব পুকরের মাছ স্বাভাবিকের মত খাবার গ্রহণ করে। শীতের পরে ১ মাস ভালভাবে খাবার প্রয়োগ করে মাছ বাজারজাত করলে মাছের আকার বড় হয় এবং ভাল দামও পাওয়া যায়। এভাবে শিং মাছ চাষিরা বছরে এক বা একাধিক মাছের ফলন লাভ করে থাকেন।

৮.৪ শিং মাছ চাষের মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা ঃ

শিং মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুতি ঃ চাষের পুকুর ব্যবস্থাপনায় পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে পুকুর সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী। মাছ চাষের সফলতা অনেকাংশে এর উপর নির্ভর করে। পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে।

তলার অতিরিক্ত কাদা অপসারণ ঃ পুকুরের তলায় ১০-১৫ সে.মি. এর বেশী কাদা থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে, সহজে হররা টানা যায় না ও অক্সিজেন সমস্যা হতে পারে। পুকুরের তলদেশের পাটি পুকুরের পাড়ের উপরে দিতে হবে। ঢালে কাদার তলার মাটি দেয়া ভাল, অন্যথায় পুকুরে পানি দেবার পর ঢালের মাটি ক্রমান্বয়ে পুনরায় পুকুরের তলদেশে চলে যাবে এবং পরিবেশ নষ্ট করবে।

মাছ আহরণের জন্য গভীর অংশ (Fish Catch Pit) মেরামত ঃ শিং মাছ সহজে ধরার জন্য পুকুরের তলদেশ একদিকে ঢালু হতে হবে এবং পুকরের আয়তনের উপর নির্ভর করে (১০ x ১০ বর্গফুট আকারের) যেদিকে পুকুরটি ঢালু সেদিকে একটি তুলনামূলক গভীর অংশ সৃষ্টি করতে হবে। এরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পানি স্বেচ দিয়ে মাছ ধরার সময় সমস্ত মাছ পানির সাথে ঐ গর্তের মাঝে জমা হবে এবং সহজে আহরণ করা যাবে। শিং মাছ যেহেতু জালে সব আসে না এবং পানি সেচ দিয়ে ধরতে হয় সেজন্য পকুরের ঢালু অংশে এধরনের ব্যবস্থা অত্যন্ত সহায়ক। পুকরে এ ধরনের গভীর অংশ থাকায় পুকরে পানি সহজে সেচ দিয়ে নিঃশ্বেস করা যায়।

ব্লিচিং পাউডার ঃ শিং মাছ চাষে ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে, এ জন্য পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন) প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে পুকুরের তলদেশ দূষণ মুক্ত করা প্রয়োজন। ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগকরলে পুকুরে জলজ পরিবেশের বা পুকুরের তলদেশের মাটির সকল ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়াকে ধবংশ করে যায়।

চুন প্রয়োগ ঃ মাছ চাষে চুন প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। চুন ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ অজৈব যৌগ যা এসিড মাধ্যমকে ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ করে মাছ চাষের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। চুনের মাত্রা ঃ পুকুর প্রস্তুতের সময় পুকরের বিদ্যমান পিএইচ মাত্রার উপর বা তলদেশের কাদার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শতাংশে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুনের কার্যকরীতা ভাল পেতে সাদা চাকা পোড়া চুন (CaO) প্রয়োগ করতে হবে। পাউডার চুন বা কলি চুন ($Ca(OH)_2$) এর কার্যকরীতা কম।

সার প্রয়োগ ঃ শিং মাছ চাষে সাধারণত পুকুরে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তবে যেহেতু শিং মাছ সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না সে জন্য অগভীর তথা ৩-৪ ফুট গভীরতার পুকুরের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করে শিং মাছের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সারের মাত্রা পুকুর ভেদে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম এবং টিএসপি ১০০-১৫০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরের পানির স্বচ্ছতা কমানোর জন্য বা প্রাকৃতিক খাদ্য প্রস্তুতের জন্য অনেক চাষি শিং মাছের পাউডার নার্সারি খাবার কিছুটা বেশি মাত্রায় পানিতে গুলিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করে থাকেন। এ কাজটি শতকে ২০০-২৫০ গ্রাম হারে সরিষার খৈল পানিতে ২-৩ দিন ভিজিয়ে জৈব সারে পরিণত করে প্রয়োগ করেও করা যেতে পারে।

পুকুরের চারিদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপন ঃ শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পুকুরের চারিদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি বা ঘের দেওয়া। সাধারণত ঘন ফাসের নাইলোন জাল বা বাঁশের বানা দিয়ে বেড়া তৈরি করা যেতে পারে। বেষ্টনী তৈরি করার প্রধান উদ্দেশ্য হল মাছ শিকারী ক্ষতিকর প্রাণী

সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল প্রভৃতিসহ অন্যান্য প্রাণির প্রবেশ বন্ধ এবং বর্ষার সময় পরিপক্ব মাছ পাড় বেয়ে বেরিয়া যাওয়া বন্ধ করা। বেস্টনী স্থাপনের জন্য পুকুরের পাড়ের উপর চতুরদিকে ৬ ইঞ্চি গভীর করে পরীখা খনন করে এ গর্তের মধ্যে ৮-১০ ফুট পর পর বাঁশের খুটি বা গাছের ডাল শক্ত করে পুতে দিতে হবে। এর পর নাইলোনের নেট দ্বারা পুকুর পাড়ের চতুরদিকে ঘীরে ফেলতে হবে। পুকুরে পানি প্রবেশের আগে অথবা পানি প্রবেশের সাথে সাথে এ বেষ্টনী তৈরী করতে হবে।

৮.৫ মজুদ কালীন ব্যবস্থাপনা ঃ

মাছ চাষের ধারাবাহিক কার্যক্রমের এ পর্যায়ে লাভজনক মাছ চাষ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কতকগুলো কাজ করতে হয় যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

মজুদ ঘনত্ব ঃ মাছ চাষের সফলতার অন্যতম প্রধান একটি নিয়ামক হচ্ছে মজুদ ঘনত্ব। মজুদ ঘনত্ব বলতে কোন একক জলাশয়ে (শতাংশ) কত পরিমাণ পোনা মাছ মজুদ করে চাষ করা হবে তার মাত্রা বা পরিমাণ বোঝায়। মজুদ ঘনত্ব খুব কম বা বেশি হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছ চাষে লাভ হয় না। মজুদ ঘনত্বের উপর মাছের খাদ্যের প্রয়োগের পরিমাণসহ অনান্য খরচ নির্ভরশীল। তাই অধিক পরিমাণে পোনা মাছ পুকুরে মজুদ করা হলে চাষের সামগ্রিক খরচ বেড়ে যায়। এ ছাড়া জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা (Carrying capasity) থাকে। উধাহরণ সরুপ বলা যেতে পারে ১ বিঘা জমিতে ৪০-৫০ কেজি ধানের বীজ বপণ করলে যেমন ধান হবে না তেমনী ১০০ লি. ধারণ ক্ষমতার পাত্রে উক্ত পরিমাণের বেশি পানি রাখা যাবে না। তেমনী পুকুরেও নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত মাছ মজুদ করা হলে প্রত্যাশিত মাত্রায় উৎপাদন পাওয়া যাবে না, বহুবিধ সমস্যা দেখা দিবে। মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে চাষের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ, পোনার আকার, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের ধরন ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং চাষির মাছ চাষের অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থের উপর। পানি ব্যবস্থাপনা বলতে পুকুরের পানি পরিবর্তন, পানির অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য এরেটর স্থাপন বোঝায়। পুকুরের পানির গভীরতার উপরও পোনা ছাড়ার মজুদ ঘনত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। পুকুরের গভীরতা ৩-৪ ফুট হলে যে পরিমাণ পোনা ছাড়া যাবে ৫-৬ ফুট হলে তার থেকে বেশি পোনা মাছ ছাড়া যাবে।

৮.৬ পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন ঃ

শিং ও মাগুর মাছের পোনা পরিবহন রুই জাতীয় মাছের পোনা পরিবহনের মত হলেও কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এসব মাছ কাটা যুক্ত হওয়ায় বড় আকারের পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেস সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। শিং ও মাগুরের ছোট পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করা উত্তম। শিং মাছের পোনার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে তা মজুদ পুকুরে স্থানন্তর যোগ্য হয়। পোনা সংগ্রহের সময় ভাল জাত নিশ্চিত হবার জন্য পোনা উৎসের বিষয়ে ভালভাবে খোজ খবর নিতে হবে এবং ভাল জাতের ঋষ্ট পুষ্ট পোনা সংগ্রহ করতে হবে। পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রধানত এলুমিনিয়ামের পাতিল বা প্লাষ্টিকের ড্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় প্লাষ্টিকের ড্রামে পরিমাণ মত পোনা অর্থাৎ ৫০ লিটার পানিতে ৫০০০ পোনা নিয়ে ড্রামের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, এক্ষেত্রে ড্রামের মুখের ঢাকনি ছিদ্র করে বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৮.৭ পোনা অবমুক্তকরণ ঃ

পোনা ছাড়ার আগে পুকুরের পানিতে তাৎক্ষনিক অক্সিজেন সরবরাহের জন্য সোডিয়াম পারকার্বনেট ৩০ শতকে ০.৫ কেজি হারে পানিতে ছিটিযে দিতে হবে। এর পাশাপাশি জীবাণু নাশক পিরিমাণমত পানিতে

ভালভাবে গুলিয়ে পুকুরে ছিটিযে দিলে পোনার বাচার হার ভাল হবে। এ কাজটি পোনা ছাড়ার পরও করা যেতে পারে। পোনা অভ্যস্থ করার পর পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাহিরের থেকে ভিতরের দিকে শ্রতের ব্যবস্থা করলে পোনা শ্রোতের বিপরিতে ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। পোনা সাধারণত সকালে অথবা বিকালে ছাড়তে হবে। পোনা পুকুরে ছাড়ার ১২ ঘন্টা পরেও আর একবার সোডিয়াম পারকার্বনেট এর ডোজ দেয়া যেতে পারে। এর ফলে পোনা নতুন পরিবেশে সহজে স্বাচ্ছন্দ বোদ করবে এবং পোনা বাচর হার বেশি হবে।

৮.৮ মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

শিং মাছ বা মাছ চাষে অধিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য পুকরে সুষম ভাল মানের সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। শিং মাছ সাধারণত কিট পতঙ্গ জাতীয় খাবার খেয়ে বড় হয়। সম্পূরক খাবার দিয়ে চাষের জন্য অধিক আমিষ সমৃদ্ধ (৩০% এর অধিক) খাবার সরবরাহ করতে হয়। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মাত্রার আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন হয

খাদ্য তৈরী ঃ শিং মাছের খাবার দুই ভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

নিজস্ব খামারে তৈরি ঃ শিং মাছ চাষের জন্য নিজস্ব খামারে বা বাড়িতে সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। নিম্নে উল্লেখিত উপকরণ ব্যবহার করে খামারে শিং মাছের খাবার তৈরি করা যেতে পারে। নিজস্ব খামারে খাবার তৈরি করে শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে মজুদ ঘনত্ব কিছুটা কম দিতে হবে।

ক্র.নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ (%)	প্রোটিন এর পরিমাণ
১.	ফিসমিল	৪০	২২
২.	সরিষার খৈল	১৮	৫
৩.	সোয়াবিন খৈল	৫	২
৪.	অটোকুড়া	২০	২.৫
৫.	ভূট্যা	১০	১,৫
৬.	আটা	৩	
৭.	চিটাগুড়	৩	
৮.	ভিটামিন প্রিমিক্স	১	৩৩%

উপকরণ সমূহ আনুপাতিক হারে মিশিয়ে ভিজা এবং ছোট আকারের পিলেট মেশিন দ্বারা পিলেট এ দুই ধরনের খাবারই তৈরি করা যেতে পারে। খাবার তৈরির ১২ ঘন্টা আগে সরিষার খৈল ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজা খাবার তৈরি করে বেশি সময় ঘরে রাখা যাবে না। খামারে খাবার তৈরি করলে খাদ্যের উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফুটিয়ে সিদ্ধ করে বানালে খাদ্য মাছের শরীরে বেশি কাজে লাগবে।

বাণিজ্যিক খাবার ঃ

খাদ্য প্রয়োগ ঃ পুকরে পোনা মজুদের পর নার্সারি খাবার ০.৫ মিমি. (মাছের ওজনের ২৫-৩০% হারে) পানিতে ভাষিয়ে দিতে হবে। মোট খাবার ভোরে এবং সন্ধ্যায় বিভক্ত করে পুকরের এক পাড় বরা বর ছিটিয়ে দিতে হবে। বড় পুকুর হলে সকল পাড় বারাবর দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে মাছে খাবার সব খাচ্ছে কি না। না খেলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১০ থেকে ১৫ দিন পর পোনার আকার বড় হলে ০.৮মিমি. এর দানাদার ভাসমান নার্সারি খাবার দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে মাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে খাবারের আকারও বড় হবে।

মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাবারের আকার (মিমি)	মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাবারের আকার (মিমি)
৮০০-৬০০	০.৫	১০০-৬০	২.০
৬০০-৩০০	০.৮	৬০-৩০	২.৫
৩০০-২০০	১.০	৩০-১৫	৩.০
২০০-১০০	১.৫		

নার্সারি খাবারের পর, প্রিস্টাটার, স্টাটার, গ্রোয়ার এবং শেষে ফিনিসার এভাবে মাছ চাষ চলা কালে ক্রমন্বয়ে খাবার পরিবর্তন করতে হবে। মাছের দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে নিম্নরূপ হারে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্য দেবার হার (%)	মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্য দেবার হার (%)
৩০০০-২০০০	৫০-৪০	১১০-৮০	১৪-১২
২০০০-১২০০	৪০-৩০	৮০-৬০	১২-১০
১২০০-৮০০	৩০-২৫	৬০-৪৫	১০-৮
৮০০-৪৫০	২৫-২০	৪৫-৩৫	৮-৭
৪৫০-৩০০	২০-১৮	৩৫-২৮	৭-৬
৩০০-২২০	১৮-১৬	২৮-২০	৬-৫
২২০-১৬০	১৬-১৫	২০-১৫	৫-৪
১৬০-১১০	১৫-১৪	১৫-১০	৪-৩

নমুনায়ন (Sampling) ও খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ চাষের মাছের থেকে কিছু মাছ ধরে মাছের গড় ওজন পরিমাপ করে সমস্ত মাছের ওজন (Biomass) বের করে খাবারে পরিমাণ সমন্বয় করা প্রয়োজন। এ কাজ শিং মাছের ক্ষেতে প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর করা যেতে পারে। সঠিকভাবে নমুনায়নের জন্য মোট মাছের ১০% মাছ ধরে নমুনায়ন করতে হবে এবং মোট ওজন বের করার ক্ষেত্রে ৯০% বাচার ধরতে হবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নমুনায়নে উক্ত পরিমাণ মাছ ধরা কঠিন হয়। শিং মাছের ক্ষেত্রে আরো বেশি কঠিন এবং সে কাজ করাও ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে মজুদতৃত মাছ থেকে ৫০-১০০টি মাছ ধরে নমুনায়ন করা যেতে পারে। মোট মাছের ওজন = (নমুনাকৃত মাছের মোট ওজন ÷ নমুনায়নে মাছের সংখ্যা) X মজুদকৃত মোট মাছের সংখ্যা (৯০%)।

খাবার প্রদানের কৌশল ঃ নির্ধারিত সমস্ত খাবার একবারে পুকুরে ছিটিয়ে না দিয়ে কয়েক বারে প্রয়োগ করতে হবে এবং খাবার প্রদানে একটু সময় নিয়ে খাবার দিতে হবে। প্রতি বারের খাবার কয়েকভাগে বিভক্ত করে প্রয়াগ করতে হবে। মাছের খাবার গ্রহণের হার পর্যবেক্ষণ করে পরের খাবার দিতে হবে। আর মাছে সবসময় সমান খাবার খায় না। এজন্য সার্বিকভাবে মাছের খাবার গ্রহণ আচারণ পর্যবেক্ষণ করে খাবার সমন্বয় করতে হবে।

৮.৯ শিং মাছের পুকুরের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ঃ

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিং মাগুর মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতি দিন নিয়মিত হারে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োগ করায় মাছের মল ত্যাগ এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট পানিতে পঁচে পুকুরের পানিতে নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থের উপস্থিতি বেড়ে যায়। খাদ্যে প্রটিনের পরিমাণ যত বেশি হবে তার বর্জে তত বেশি পরিমাণ নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থ পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসবে। ফলে পানিতে এমোনিয়া ও নাইট্রেট যৌগের উপস্থিতি বেড়ে যায় এবং মাছ চাষে নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। এক হিসাবে দেখা যায় ২৫ ভাগ আমিষ সমৃদ্ধ ভাল মানের ১ কেজি খাদ্য হতে পানিতে প্রায় ২.৪৯ গ্রাম এমোনিয়া যুক্ত হয়। পুকুরের পানিতে পিএইচ কোন কারণে বেড়ে গেলে এমোনিয়াম আয়োনিত এমোনিয়াতে পরিণত হয় যা মাছের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর। সাধারণত পুকুরের পানিতে এর মাত্রা ০.০১ পিপিএম এর বেশি হলে মাছ বিপদে পড়ে যায়।

মনে রাখা দরকার যে আমরা মাছ চাষে যে পরিমাণ খাবার প্রয়োগ করি তার ৮০ % বর্জ্য হিসেবে পুকুরের পানিতে ফিরে আসে এবং পানির পরিবেশ নষ্ট করে। শুধু পরিবেশ নষ্টই নয় পুকরের তলদেষের মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে মাটির গঠন ও রং পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। পুকুরের সার্বিক পরিবেশ নষ্ট হলে মাছ প্রাথমিকভাবে পীড়ণ (Stress) অবস্থার সম্মূখিন হবে, পানিতে ক্ষতিকর গ্যাসের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পাবে, প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব হবে, মাছের খাদ্য গ্রহণ হার কমে যাবে, খাদ্যের এফসিআর ঋণাত্বকভাবে প্রভাবিত হবে, পরিশেষে মাছের নানা প্রকার রোগ হয়ে মাছে মড়ক দেখা দিবে। এ জন্য পুকরের পানির সার্বিক পরিবেশ ভাল রাখার জন্য নিম্ন রুপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

পুকুরের পানি সরবরাহ ঃ পুকুরে পানি প্রতি ১০-১৫ দিন পরপর আংশিক পরিবর্তন করতে হবে। এ কাজটি করার জন্য পুকুরের পানি কিছুটা (নুন্যতম ১০%) আগে বের করে দিতে হবে, পানি বের করে দেবার ক্ষেত্রে তলদেশের পানি বের করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে পুকুরের তলদেশে জমে থাকা অপদ্রব্য পানির সাথে বেরিয়ে যেতে পারে। পুনরায় নতুন পানি দিয়ে সে অংশ পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে খালের বা নদীর পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানি ছেকে প্রবেশ করাতে হবে। গভির নলকুপের ক্ষেত্রে অধিক আয়রন যুক্ত পানি ব্যবহার করা যাবে না। পুকুরে পানি প্রদান করলে পুকুরের সার্বিক পরিবেশ উন্নতি লাভ করবে। পানির ক্ষতিকর গ্যাস পাতলা (Dilution) হবে, পানিতে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়বে, মাছ স্বাচ্ছন্দ বোদ করবে এবং মাছের খাবার গ্রহণ হার বাড়বে।

মাছচাষ চলাকালিন চুন প্রয়োগ ঃ মাছ চাষ চলা কালে পরিবেশ ভাল রাখার জন্য প্রতি ১৫-২০ দিন পর পর শতাংশ প্রতি ২০০ গ্রাম হারে সাদা চাকা পোড়া চুন পানিতে ভাল ভাবে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরে পর্যায় ক্রমে একবার চুন এবং এক বার জিওলাইট (১০০ গ্রাম প্রতি শতাংশে) ব্যবহার করা যেতে পারে। জিওলাইট পুকুরের ক্ষতিকর গ্যাস শোষণ করে পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এ ছাড়াও পুকুরের রোগ জীবাণু দমনের জন্য মাঝে মধ্যে ব্লিচিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন)) শতাংশে ১০০ গ্রাম হারে ব্যাবহার করা যেতে পারে।

তলদেশের বর্জ্য শোধন ঃ মাছের বর্জ থেকে পুকুরের তলদেশে যে ক্ষতিকর গ্যাস জমে তা দূর করার জন্য নিয়মিত বিরতিতে বাজারে প্রাপ্য Yucca সমৃদ্ধ উপকরণ (2gm/Dec) ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়াও মাছ চাষ চলা কালে প্রতি মাসে এক ডোজ প্রোবায়টিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে এতে ক্ষতিকর গ্যাস দূর করার পাশাপাশি উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ কমে যাবে। বাজারে বেশ কয়েকটি প্রোবায়টিক্স পাওয়া যায়। যে কোন একটি প্রোবায়টিক্স পরিমাণ মত নিয়ে ২০০ গ্রাম চিনি এবং ২০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। এ মিশ্রণে ১০ গ্রাম সোডিয়াম পার কার্বনেট ব্যবহার করা যেতে পারে। সৃষ্ট উপকারী ব্যাক্টেরিয়া পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ অপসারণ করে ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগের রুপান্তর ঘটিয়ে পুকুরে সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাবে।

যান্ত্রিক এরেটর স্থাপন ঃ বর্তমানে অনেক মাছ চাষি পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য প্যাডেল হুইল এরেটর ব্যবহার করছেন। এ ব্যবস্থা কিছুটা ব্যায়বহুল হলেও নিরাপদ। সাধারণত পুকরে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করা গেলে অধিক হারে মাছ চাষ করা যায় এবং অধিক উৎপাদন লাভ করা যায়। এধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে পুকুরের পানির বিভিন্ন স্তরের পুষ্টির মিশ্রণ ঘটে এবং পুকুরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে শীতে পানির উপরের স্তর সহজে গরম হয় এবং এরটের পরিচালনা করলে পানির উপরের স্তরের উষ্ণতা সকল স্তরে সঞ্চালন ঘটানো যায়। এরেটর ব্যবহার করলে পুকুরের পানির পুষ্টি উপাদান সুসমভাবে পুকুরে মিশবে, পানির তাপ মাত্রাসহ দ্রবিভূত অক্সিজেন বৃদ্ধি পায় এবং সাগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৮.১০ মাছের রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

রোগ বালাই মাছ উৎপাদনে অন্যতম অন্তরায়। কাঙ্খিত উৎপাদন পেতে হলে মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও শুষ্ঠু জলজ পরিবেশ বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন কারণে মাছের রোগ হতে পারে। এ সকল কারণসমূহের অন্যতম প্রধান হচ্ছে পুকুরের পানির গূণগত মানের পরিবর্তন ও দূষণ এবং মাছের পুষ্টির অভাব জনিত কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস। মাছের চাষের ক্ষেত্রে মাছে যাতে রোগ না হয় সে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ চিকিৎসা প্রয়োগের চেয়ে অধিক কার্যকর। কারণ মাছে রোগ দেখা দিলে তার সুনিশ্চিত চিকিৎসা অত্যান্ত জটিল এবং ব্যায় বহুল। মাছ পানির নিচে বসবাস করে, তার বাহ্যিক পরিবর্তন সহজে বোঝা যায় না, সমস্ত মাছ ধরে কোন ধরনের চিকিৎসা প্রয়োগও করা যায় না। রোগ হলে সকল প্রাণির মত মাছও খাবার গ্রহণ কমিয়ে দেয়, ফলে খাবারের সাথে ঔষধ প্রয়োগ করে মাছের চিকিৎসা প্রদানও সহজ নয়। শিং মাছে সাধারণত নিম্ন লিখিত রোগ বেশি দেখা যায় ঃ

১) ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ ঃ সাধারণত অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করলে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার প্রয়োগ করলে অব্যবহৃত খাবার ও জৈব পদার্থ পুপুরের তলদেশে জমে পঁচনের ফলে পানি দূষিত হয়। দূষিত পরিবেশে ব্যাক্টেরিয়া দ্রুত বংশ বিস্তার করে। সাধারণত ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ সংক্রামক।

লক্ষণঃ লেজ ও পাখনায় সাদা দাগ দেখা যায়, লেজ ও পাখনায় পঁচন ধরে এবং ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ফুলকা ফুলে যায়, ফ্যাকাশে হয় ও পঁচে যায়।

প্রতিকার ঃ

ক) ১-২ পিপিএম হারে পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

খ) প্রতি কেজি খাবারের সাথে ১০ গ্রাম (Probiotics) ৪-৫ দিন দিতে হবে। এর পাশাপাশি খাবারের সাথে ভিটামিন সি প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে কোন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ পর তার উড্রোল পিরিয়ড পার করে মাছ বাজারে পাঠাতে হবে। এ ক্ষেত্রে ২১ দিন পরে মাছ বাজারে পাঠাতে হবে।

২) শিং মাছের মুখে ও কাটায় সাদা দাগ রোগ ঃ শিং মাছ চাষে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায় এবং চাষে বেশ ক্ষতি সাধিত হয়। এ সময় মাছ উলম্বিকভাবে পানির উপরের স্তরে ভেসে থাকে। খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে মাছের মুখে এবং দুপাশের কাটার গোড়ায় সাদা দাগ দেখা যায়। প্রতি দিন কিছু মাছ মারা যায় এবং পুকুরের তল দেশে জমতে থাকে। এ রোগ দেখা দিলে চাষি মাছ চাষে বেশ ক্ষতির সম্মূখিন হয়ে থাকে।

প্রতিকার ঃ খাবারের সাথে (Probiotics)) ৪-৫ দিন দিতে হবে। এর পাশাপাশি খাবারের সাথে ভিটামিন সি প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে পানিতে জীবাণু নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে কোন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ পর তার উড্রোল পিরিয়ড পার করে মাছ বাজারে পাঠাতে হবে। এ ক্ষেত্রে ২১ দিন পরে মাছ বাজারে পাঠাতে হবে।

৮.১১ মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ ঃ

মাছ উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়মিত খাদ্য এবং পরিচর্যা চালিয়ে গেলে ৪-৬ মাস বয়সে গড়ে মাছের আকার ৭০ গ্রাম হয়ে যাবে। এ আকারের মাছ বাজারজাত করার জন্য উপযুক্ত হয়। মাছ আহরণের পূর্ব দিনে কোন প্রকার খাদ্য প্রয়োগ করা যাবে না। শিং মাছ আহরণ করার উপযুক্ত সময় হলো রাত্রে বেড় জাল দিয়ে টেনে মাছ ধরে হাউজে মজুদ করে রাখা। তবে পূর্ণ আহরণের জন্য পুকুর সেচে সম্পূর্ণ পানি অপসারণ করতে হয়। শিং মাছ বিশাক্ত কাটা ওয়ালা মাছ এজন্য এ মাছ ধরার সময় বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণত এক হাতে মাছ রাখার পাত্র অন্য হাতে ছোট একটি বাটি দ্বারা মাছ কাদার ভিতর থেকে ধরে হাতে ধরা পাত্রে মজুদ করতে হয়। হাতে ধরা পাত্রটি মসৃন এবং ছিদ্র যুক্ত হওয়া ভাল। শিং মাছের বিষাক্ত কাটার কারণে মাছ সরাসরি হাত দিয়ে ধরা যায় না। মাছ বাটি দ্বারা ধরে প্লাষ্টিকের হাপা বা ব্যারেলে রাখতে হবে। ক্যারেটে বা খসখসে পাত্রে না রাখাই ভাল। আহরিত মাছ বাজার পাঠানোর আগ পর্যন্ত পানির ফোয়ারাযুক্ত হাইজে বা হাপাতে রাখতে হবে।

আহরণপরবর্তী মাছের পরিচর্যা (Post Harvest Care) ঃ আহরণের পর আমাদের দেশে মাছের সঠিক যত্নের অভাবে মাছে গুণগত মানের ক্ষতি হয়, মাছের সজিবতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য শিং মাছ আহরণের পর একটি হাপার ভিতরে বা সিমেন্টর সিস্টার্ণে জমা করে রাখতে হবে এবং পানির ফোয়ারা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পানির সাওয়ারের মাধ্যমে মাছের সাথে আসা কাদা পরিস্কার হয়ে যাবে। সবসময় মাছ এমনভাবে ধরতে হবে যেন মাছের গায়ে দাগের সৃষ্টি না হয়। মাছ পুকুর থেকে মাছ ধরার পর মাছ পরিবহন পাত্রে অধিক পরিমাণে চাপে মাছ হাপাতে বা সিস্টার্ণে আনা যাবে না। সিস্টার্ণের মধ্যেও ধারণ ক্ষমতার অধিক রাখা যাবে না বা বেশি সময় ধরে মজুদ রাখা যাবে না। বাজারে প্রেরণের সময় পরিবহন পাত্রে অধিক ঘনত্বে পরিবহন না করায় ভাল কারণ মাছ আঘাত প্রাপ্ত হলে বেশি সময় সজিবতা থাকে না এবং মাছের গায়ের রং নষ্ট হয়ে যায়।

৮.১২ শিং মাছ চাষের লাভ ক্ষতি বিশ্লেষণ ঃ

বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অল্প ব্যায়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা। কাজেই যে কোন প্রকার মাছ চাষের বেলায় আয় ব্যায়ের হিসাব নিরুপণ করা অতীব জরুরী কাজ। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষি আয় ব্যায়ের হিসাব সঠিকভাবে করেন না। সাধারণত চাষ শেষে মোট বিক্রয়ের উপর আনুমানিক হিসাব নির্ণয় করে থাকে। এতে প্রকৃত লাভের চিত্র পাওয়া যায় না। এছাড়া নিজস্ব খাবারের জন্য ব্যবহৃত, আত্মীয় সজনসহ অন্যান্যদের বিলি-বন্টনকৃত মাছও হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয় না। কাজেই মাছ চাষের আয় ব্যায়ের হিসাব সঠিকভাবে নির্ণনয়ের জন্য হিসাব খাতা সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

শিং মাছের একক চাষের আয় ব্যায়ের নমুনা হিসাব (জলায়তন ৩০ শতাংশ) ঃ

ক্র. নং	উপকরণের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট খরচ	মন্তব্য
১.	সংস্কার			১০,০০০/-	
২.	চুন	৬০ কেজি	২০/-	১২০০/-	
৩.	ইউরিয়া	৬ কেজি	২০/-	১২০/-	
৪.	টিএসপি	৬ কেজি	৩০/-	১৮০/-	
৫.	মাছের পোনা শিং	৩০,০০০টি	১.৫০	৪৫,০০০/-	
	কার্প	১৫০টি	৫/-	৭৫০/-	
৬.	খাদ্য	২৪০০ কেজি	৬৫/-	১,৫৬,০০০/-	
৭.	বিবিধ			২০,০০০/-	
		মোট খরচ		২,৩৩,২৫০/-	

উৎপাদন

শিং মাছ (বাচার হার ৮০%, ২০টিতে কেজি) = ১২০০ কেজি, মোট মূল্য ১২০০ x ৩৫০ = ৪,২০,০০০/-
কার্প জাতীয় মাছ (১০০ % বাচার হার) = ১৫০ কেজি, মোট মূল্য ১৫০ x ১৫০ = ২২,৫০০/-

---

সর্বমোট = ৪,৪২,৫০০/-

নীট লাভ = (মোট আয় - মোট খরচ) = ৪,৪২,৫০০/- - ২,৩৩,২৫০/- = ২,০৯,২৫০/- টাকা।

মাছ চাষের রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

শিং মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুতি, পোনা সংগ্রহ, খাদ্য প্রয়োগ, ঔষধ প্রয়োগ, নমুনায়ন, আহরণ, বাজারজাতকরণ সহ প্রতিটি ধাপের রেকর্ড লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা উত্তম। উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice) এর জন্য রেকর্ড সংরক্ষণ অতিব পয়োজন।একটি রেকর্ড বইয়ে চাষীর নাম, ঠিকানা, পুকুরের অবস্থা, আয়তন ও বৈশিষ্ট, চুন, সার, ঔষধের নাম, প্রয়োগের পরিমান, তারিখ, মজুদ সংখ্যা, আকার, মজুদের তারিখ, চাষকালীন সার ও খাদ্য প্রয়োগের তারিখ ও মাত্রা, ক্রয় মূল্য, মাছ চাষের নমুনায়ন ও মাছের শারীরিক বৃদ্ধির হার, আহরণ ও বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি তথ্য নিয়মিত লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এসব লিখিত তথ্য সংরক্ষণ করলে তা যুগপতভাবে চাষীর ভবিষ্যত চাষের পরিকল্পনা গ্রহণে এবং নতুন বছরের চাষে উন্নয়ন ও অগ্রগমন ঘটাতে সহায়তা করবে। সার্বিক চাষ ব্যবস্থা মূল্যায়নে এবং তুলনা মূলক বিচার বিশ্লেষণে সহায়তা করবে।

অধিবেশন - ৯

মাছ চাষে কিছু সমস্যা ও প্রতিকার ঃ

সমস্যা	কারণ	প্রতিক্রিয়া	প্রতিকার
১.খাবি খাওয়া/হা করে পানির উপর ভাসে। বিশেষ করে আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে এই সমস্যাটিতে প্রায়ই মাছ ও চিংড়ি মারা যায়।	তলায় কাঁদা, বিষাক্ত গ্যাস, পঁচা পাতা, হিসাবের বেশী মাছ থাকা, আকাশে মেঘ	মাছ মারা যায়	সাঁতার কাটা, বাঁশ দিয়ে পানি পিটানো, সম্ভব হলে পানি বদল করা, বড় পাতিল ঝাকানি দিয়ে ঢেউ তোলা, কৃত্তিমভাবে পানি ছিটানো, অক্সিজেন ট্যালেট প্রয়োগ।
২. ঘোলা পানি	বৃষ্টির পানি ধুয়ে পুকুরে ঢোকে, পাড়ে ঘাস না থাকা, গরু গোসল করানো	খাদ্য জন্মায় না, সূর্য্যের আলো ঢুকতে পারে না,	শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম চুন, ছোট আকারে খড়ের মোচা ৪/৫ জায়গায় পানিতে স্থাপন করা।
৩.পানির উপরের স্তর ঘন সবুজ হওয়া	ইউগ্লিনা নামক শেওলা	খাবি খায়, শ্বাস কষ্ট,	সার দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সিলভার কার্প মজুদ এবং সম্ভব হলে পানি বদল করতে হবে।
৪. পানির উপরে লাল স্তর	অতিরিক্ত লোহার কারণে লাল শেওলা	সূর্য্যের আলো ঢুকে না খাদ্য সৃষ্টি হয়না।	প্রতি সপ্তাহে কলা পাতার/খড়ের দড়ি দিয়ে তুলে ফেলা।
৫.সাপ, উদ, কাঁকড়া	পাড়ের আগাছা	মাছকে খেয়ে ফেলে	বাঁশের ফাঁদ, চুন ভর্তি ডিমের খোলস উদের পথের মধ্যে রাখা
৬. বুদবুদ উঠা	তলায় কাদা বেশী হলে, পাতা পঁচা, কোন কিছু পঁচলে বিষাক্ত গ্যাস তৈরী হয়	মাছ মারা যায়	পুকুরে ঘনঘন হররা টানা, হররা হল মাটির কাটি যাহা দড়িতে মালার মত করে তৈরী হয়। ইট দিয়ে ও হররা তৈরী করা যায়। সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে।
৭. বৃস্টির পর অনেক সময় চিংড়ি ও মাছ পানির উপর ভেষে খাবি খেতে থাকে	পানির পিএইচ কমে যাবার ফলে এটা ঘটে থাকে	মাছ ও চিংড়ি মারা যায়	প্রতিবারে ভারী বৃস্টির পর শতাংশ প্রতি ৭৫ থেকে ৮০ গ্রাম হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।
৮. তলায় কালো কাদা	অতিরিক্ত খাদ্য ও জৈব পদার্থ পুকুরের তলায় জমা হয়ে তলার মাটি কালো দূর্গন্ধযুক্ত হযে যায়। বিশেষ করে দীর্ঘদিনধরে চাষকরা পুকুরে এসমস্যা প্রকট আকারে দেখা দেয়।	ফলে বিশাক্ত গ্যাস তলায় জমা হয়ে চিংড়ি ও মাছের মড়ক দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়াও চিংড়ির দেহ কালো হয়ে বাজারমূল্য হ্রাস করে।	কার্পের সাথে চিংড়ি মজুদের পূর্বে তলার অতিরিক্ত কালো কাদা তুলে ফেলতে হবে। চাষকালীন সময়ে চিংড়ি ও মাছের মড়ক দেখা দিলি দ্রুত পানি বদল, মজুদ ঘনত্ব হ্রাস এবং সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

সমস্যা	কারণ	প্রতিক্রিয়া	প্রতিকার
৯.শামুক ও ঝিনুক এর বিস্তার লাভ	এদের পরিমান আধিক বেড়ে গেলে পানির রাষায়নিক অবস্থা ও মাছ ও চিংড়ির খাদ্যের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে	ফলে পকুরের উৎপাদনশীলতা কমে যায়।	পুকুরে মাছ ও চিংড়ি থাকা অবস্থায় অননুমোদিত রাষায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল। পুকুরে চিংড়ির অশ্রয়স্থল হিসেবে দেয়া নারিকেল বা তালের ডাল বা অন্য অশ্রয়স্থলে আটকে থাকে। এসমস্ত উপকরন মাঝে মাঝে পানির উপর তুলে ফেলে শামুক ঝিনুক সরিয়ে ফেলতে হবে। শুকনো অবস্তায় বেশী মাত্রায় চুন প্রয়োগ কররের শামুক ঝিনুক কম হয়।
১০. রাক্ষুসে প্রানি ও অবাঞ্ছিত মাছের প্রবেশ	পুকুর শুকানো অথবা বিষ প্রয়োগ করার পরেও অনেক সময় পুকুরে রাক্ষুসে প্রানি ও অবাঞ্ছিত প্রানি থেকে যেতে পারে। বাইরে থেকে শোল, টাকি, শিং, চান্দা, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ পুকুরে প্রবেষ করতে পরে।	এতে ব্যাপকভাভে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন কমে যেতে পারে।	পাখি, জাল, বৃষ্টির পানির স্রোত বা মানুষের মাধ্যমে এরা প্রবেশ করে; তাই এ সমস্ত উৎস্য থেকে সকর্ত খাকতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যা প্রতিকার করা যেতে পারে। ১. পুকুরের পাড় ঠিকমত মেরামত করা। ২. কাকড়া না ইদুরের গর্ত থাকলে তা বন্ধ কর। ৩. মাছধরা জাল ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা।

অধিবেশন - ১০

গলদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা

(Giant Fresh water prawn culture and management techniques)

১০.১ ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের মাছচাষে গলদা চিংড়ি একটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রজাতি এবং উপকূলীয় জেলা সমূহের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা, উচ্চমূল্য এবং মৃদু লবণাক্ত (৫-১০ পিপিটি) ও মিষ্টি পানিতে গলদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তির সফলতার কারনে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলকায় ক্রমাগত এটি সম্প্রসারিত হচ্ছে। গলদা চিংড়ির চাষ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে প্রতি বছরই এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিম্নলিখিত কারনে চাষীরা গলদা চিংড়ি চাষে আগ্রহী হচ্ছে ঃ

- চাষ পদ্ধতি তুলনামূলক সহজ।
- বিভিন্ন আকারের চিংড়ি বাজারজাত করা যায়, তবে প্রতি কেজিতে ২৫-৪৫ টি আকারের চিংড়িতে বেশী লাভ হয়।
- উচ্চ বাজার মূল্য, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় এর দাম প্রতি কেজি ৬০০-১০০০ টাকা।
- অগভির ঘের/পুকুরে (১.৫-২.০ মিঃ) এটি চাষ করা যায়।
- মৌসুমী পুকুরে এটি চাষ করা যায়।
- কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চাষ করা যায়।
- উপকূলীয় জেলাগুলোর স্থায়ী জলাবদ্ধতাকে কাজে লাগানো।
- ধান ক্ষেতের চারিদিকে ১০% জায়গায় নালা বা এক কোনে ১-১.৫ মিঃ গভির গর্ত করে পর্যায়ক্রমে ধান ও গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়।

গলদা চিংড়ি চাষে উপরোক্ত সুবিধাদি থাকা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কতিপয় সমস্যার কারনে এর আশানুরূপ সম্প্রসারণ ঘটেনি।

- **অবকাঠামো-** ঘের সমূহ অগভির, দূর্বল পাড় এবং পানি প্রবেশ ও নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় ফলে বিশেষত গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রচন্ড তাপে পানি গরম হয়, পানির অক্সিজেন এবং পি এইচ দ্রুত উঠানামায় চিংড়ি দূর্বল হয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়;
- **পোনা-** সরকারী/বেসরকারী হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন খুবই কম। প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা আহরণ নিষিদ্ধ, বিদেশ থেকেও আমদানী নিষিদ্ধ। ফলে চাষ মৌসুমে সুস্থ-সবল, রোগ মুক্ত পোনার ব্যাপক অভাব অনুভূত হচ্ছে;
- **খাদ্য-** গলদার জন্য তৈরী খাদ্যে আমিষ চাহিদা প্রায় ৩০-৩৫%, যা দরিদ্র চাষীদের জন্য ব্যয়বহুল;
- **পুঁজি-** কার্পের চেয়ে তুলনামূলকভাবে পুঁজি বেশী লাগে; ফলে চাষ প্রযুক্তির ধাপসমূহের যথাযথ অনুসরণ দরিদ্র চাষীর জন্য সমস্যা হতে পারে;
- **পানি ব্যবস্থাপনা-** চাষীদের পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান এবং অধিকাংশ ঘের/পুকুরে পানি তোলা ও নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা;
- **জনশক্তি-** পি এল উৎপাদনে অভিজ্ঞ জনবলের ঘাটতি;

- **উপকরণ-** প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সকল এলাকায় সহজলভ্য না হওয়া; এবং
- **বাজারজাতকরণ-** বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরত্ব থাকায় চাষীরা কাংখিত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১০.২ গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি ঃ

আমাদের দেশে সাধারনত ২ টি পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। একক চাষ পদ্ধতি ও মিশ্র চাষ পদ্ধতি।

একক চাষ পদ্ধতি ঃ

এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গলদা চিংড়ির জুভেনাইল (কিশোর চিংড়ি) ঘের/পুকুরে ছাড়া হয়। তবে বর্তমানে একক গলদাচাষ মাঠপর্যায়ে পরিলক্ষিত হয় না। চাষীরা পুকুর/ঘেরে উৎপাদিত ফাইটোপ্লাংকটনের ব্যবহার নিশ্চিত ও অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য গলদার সাথে শতাংশ প্রতি ২-৪টি কাতলার পোনা মজুদ করে থাকেন। এ ধরনের চাষ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র পুরুষ গলদা জুভেনাইল মজুদ করা যেতে পারে কারন পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে বড় হয় এবং শুধুমাত্র পুরুষ চিংড়ি আলাদাভাবে চাষ করলে উৎপাদনও বেশী হয়। নিম্নলিখিত সুবিধাদি বিবেচনায় চাষীগণ এই চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন ঃ

- এ পদ্ধতিতে চিংড়ি দ্রত বৃদ্ধি পায়;
- চাষ ব্যবস্থাপনার ধাপ সমূহ অনুসরণ করা সহজ হয়;
- একসাথে একই আকারের অধিক চিংড়ি আহরণ করা যায়;
- খাদ্য প্রয়োগ সহজ হয়;
- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়; এবং
- আর্থিকভাবে বেশী লাভবান হওয়া যায়।

উপরোক্ত সুবিধাদি থাকা সত্ত্বেও এ পদ্ধতিতে পুকুরের সকল স্তরের খাদ্য ব্যবহৃত হয় না। চাষী কর্তৃক অনুসৃত শতাংশ প্রতি ২-৪টি কাতলার অথবা উপরের স্তরের কার্প জাতীয় মাছের পোনা ব্যবহার করা উচিত।

মিশ্র চাষ পদ্ধতি ঃ

একই জলাশয়ে একই সময়ে যখন গলদা চিংড়ির সাথে অন্যান্য এক বা একাধিক প্রজাতির মাছ চাষ করা হয় তখন তাকে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ বলে। এ জাতীয় চাষ পদ্ধতিতে জলাশয়ের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যাপারে অন্য প্রজাতির মাছের সাথে প্রতিযোগী হয় না। বর্তমানে উপকূলীয় জেলা সমূহে বাগদা-গলদা-কার্প জাতীয় মাছ একই পুকুরে পর্যায়ক্রমে চাষ করে ভাল উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নলিখিত সুবিধাদিন কারনে মিশ্র চাষ পদ্ধতি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ও গৃহস্থলি পুকুর সমূহে জনপ্রিয়।

- পুকুরের সর্বস্তরের খাবারের ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- তুলনামুলকভাবে লাভজনক;
- রোগ ব্যাধি কম হয়; এবং
- অর্থনৈতিক ঝুঁকি কম থাকে

তবে গলদার সাথে চাষযোগ্য কার্পের প্রজাতি নির্বাচন সঠিক না হলে এই পদ্ধতির সুবিধা নেওয়া সম্ভব হয় না। মিশ্রচাষে গলদা চিংড়ির সাথে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কাতলা মিশ্র চাষে ব্যবহার করা যায়। উপকূলীয় এলকায় গলদার সাথে বাগদা ও কার্প পর্যায়ক্রমে চাষ করা হচ্ছে।

গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষে পুকুরের তলায় বসবাসকারী ও খাদ্যগ্রহনকারী প্রজাতি (যেমন- মৃগেল, কমনকার্প ইত্যাদি) ব্যবহার করা উচিত নয়। রাক্ষুসে মাছ গলদা চিংড়ির সাথে চাষ করা যাবে না। একক চাষে প্রতিশতাংশে ২-৪ টি কাতলা মজুদে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। এছাড়া ধান ক্ষেতের ১০% জায়গায় ৩ ফুট পানি রাখার মত গর্ত/নালা করে ধান চাষের পরে গলদা-কার্প মিশ্র চাষ করা যায়। এছাড়া মৃদু লবনাক্ত (৫-১০ পিপিটি) এলকার জেলা সমূহে ঘের/পুকুরে পর্যায়ক্রমে বাগদা ও কার্প-গলদা মিশ্রচাষ মাঠপর্যায় বেশ জনপ্রিয়।

১০.৩ গলদা চিংড়ি চাষের জন্য স্থান নির্বাচন ঃ

যে সমস্ত এলাকায় অবকাঠামোগত সুবিধা, পানির সহজলভ্য উৎস্য, উৎপাদন সামগ্রী সহজলভ্যতা এবং উৎপাদিত চিংড়ির সঠিক গুণগতমাণ বজায় রেখে বাজারজাতকরণের সুযোগ বিদ্যমান, সেখানে গলদাচাষে চাষীর উৎপাদন ব্যয় কম হয় এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন চাষ পদ্ধতির জন্য চিংড়ি খামারের সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন রকম হলেও কিছু কিছু সুবিধাদি সকল ক্ষেত্রেই একই রকম এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও প্রায় একই ধরণের। গলদা চিংড়ি চাষের খামারের স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখা উচিত।

১) দূষণমুক্ত এলাকা ঃ শহর বা শিল্প এলাকা যেখানকার বর্জ্য পদার্থ পার্শ্ববর্তী নদী/খালে পড়ে সে সব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা ঝুঁকিপূর্ণ। এ ছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক সার ইত্যাদি এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ। অতএব এ সব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই উত্তম।

২) মানগ্রোভ ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে চিংড়ি চাষ করা যাবে না।

৩) প্লাবন ও অতি বৃষ্টিজনিত ঢলমুক্ত এলাকা ঃ এ সকল এলাকায় পানির বিভিন্ন গুণাগুন হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে চিংড়ি চাষ ব্যাহত হয়। তাছাড়া এ সকল এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ব্যয় বহুল ও পানিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে যা ক্ষতির কারণ। অতএব, এ সব এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই উত্তম।

৪) পানির উৎসঃ চিংড়ি খামার এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে স্বাদু পানির উৎস্য থেকে সহজেই পানি খামারে ঢুকানো ও বের করা যায় এবং পানি উৎস্য দূষণমুক্ত হয়।

৫) পোনা ও চাষ উপকরানাদির প্রাপ্যতা ঃ চিংড়ি পোনা সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং চাষ উপকরণাদি যেমন-চুন, সার, খাদ্য ইত্যাদি সহজে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

৬) অবকাঠামোগত সুবিধাদি ঃ খামার স্থাপন কালে এলাকায় অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন-বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সড়ক যোগাযোগ, বিপনন ইত্যাদির সুবিধা থাকা বাঞ্চনীয়

৭) কৃষির সাথে সমন্বয় করে চিংড়ি চাষের পরিকল্পনা করতে হবে।

৮) অন্যান্য ঃ নিরাপত্তা, সামাজিক পরিবেশ, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি বিষয়াদি খামার স্থাপন কালে বিবেচনা করা উচিত।

গলদা চিংড়ি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়াদি অত্যাবশ্যকীয় হলেও ছোট পরিসরে বা ক্ষুদ্র পরিসরে প্রান্তিক চাষীগনের জন্য সকল বিষয় বাধ্যতামূলক নয়।

মাটির গুণাগুণ ঃ

দো-আঁশ এবং বেলে দো-আঁশ মাটি গলদা চাষের পুকুরের জন্য অধিকতর উপযোগী। এছাড়া মাটিতে নিম্নলিখিত উপাদনের উল্লেখিত মাত্রায় বিদ্যমান থাকলে গলদা চিংড়ি ঘের/পুকুরের পানি ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা সহজ হয়।

জৈব পদার্থের পরিমান ১-২%
পিএইচ - ৬.৫-৮.৫
ফসফরাস - ১০-১৫ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম
নাইট্রোজেন - ৮-১০ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম

গলদা চিংড়ি ঘের/পুকুরের পানির ভৌত গুনাবলী ঃ

পানির গভীরতা ঃ উষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলে গভীরতার কারণে সূর্যালোকের প্রভাবে পানিতে তিনটি স্তরের সৃষ্টি হয়। যথা- ইপিলিমনিয়ন (উপরের স্তর), থার্মোক্লাইন (মধ্য স্তর) হাইপোলিমনিয়ন (নিচের স্তর)। বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরের গভীরতা ২-৩ মিটারের মধ্যে। ফলে হাইপোলিমনিয়ন স্তরটি দেখা যায় না। উপরের স্তরই মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। নার্সারী পুকুরের গভীরতা বেশি হলে চিংড়ির পিএল পানির চাপ সহ্য করতে পারে না। পিএল অগভীর পানিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। নার্সারী পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিঃ হলে ভালো হয়।

তাপমাত্রা ঃ গলদা চিংড়ির তাপমাত্রা সহনশীলতার একটি মাত্রা রয়েছে। পানির তাপমাত্রার সাথে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন এবং গলদা চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত। গলদা চিংড়ি উৎপাদনে সহায়ক আদর্শ তাপমাত্রা ২৮-৩১ সেঃ।

সূর্যালাক ঃ সূর্যই সকল শক্তির উৎস। সূর্যালোকের প্রাপ্ততা ও প্রখরতর ওপর সালোক সংশ্লেষণ নির্ভরশীল যা থেকে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। গলদা নার্সারী পুকুরে দৈনিক কমপক্ষে ৬ -৮ ঘণ্টা সূর্যালোক পড়া ভালো।

১০.৪ পুকুর প্রস্তুতি ঃ

১০.৪.১ পাড় ও তলা মেরামত ঃ

তলদেশ শুকানো ঃ

নূতন চাষ শুরু করার আগে এবং প্রতি ফসল আহরণের পর পুকুর/ঘের পানি নিস্কাশন করে শুকানো উচিত। চাষকালীন সময়ে নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাওয়ার জন্য পুকুর শুকানো উচিত ঃ

- তলদেশের বর্জ্য অপসারণ করা যায়।
- জৈব বর্জ্য খনিজায়ণে (অক্সিডেশন) সহায়তা করে।
- অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড কম হয়।
- রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত প্রাণীর অপসরণ সহজ হয়।
- জীবাণু হ্রাস করে রোগের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- প্রয়োজনীয় মেরামত করা যায়।

তবে কষ মাটি (এসিড সালফেট) বেশী শুকালে মাটির নিচের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি মাটির উপরের স্তরে উঠে আসে এবং মাটির এ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। কষ মাটি এমনভাবে শুকাতে হবে যেন মাটির উপর দাঁড়ালে ২-৩ সেঃ মিঃ মাটিতে পা বসে যায় এবং মাটি হাত দিয়ে তুলে দলা পাকানো যায়।

পাড় মেরামত ও কালো কাদা অপসারণ ঃ

চিংড়ি চাষের জন্য ঘের/ খামার প্রস্তুতিকালে কখনও কখনও পাড় মেরামত ও তলার কালো কাদা অপসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ ঘের/খামারের ভাঙ্গা পাড় মেরামত ও কালো কাদা অপসারণ করা না হলে চাষকালীন সময়ে নানা ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পাড় মেরামত করা না হলে-

- বাহির থেকে রাক্ষুসে প্রাণী ও অবাঞ্ছিত মাছ প্রবেশ করতে পারে;
- বর্ষা বা অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় চিংড়ি ও মাছ ভেসে যেতে পারে;
- খাড়া পাড় বিশিষ্ট পুকুরের চিংড়ি আহরণে সমস্যা হয়, এক্ষেত্রে অনুপাত ১ঃ১ বা ১ঃ২ অনুসরন করা উচিত;
- বাইরের দূষিত পানি খামারে প্রবেশ করতে পারে; এবং

পাড় মেরামত ঃ

- পুকুরের পাড় এমন উঁচু করতে হবে যাতে স্বাভাবিক বর্ষায় ডুবে না যায় এবং বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পুকুরে যেতে না পারে।
- পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাইরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।
- পাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তা ভরে দিতে হবে যাতে বাইরের পানি চুইয়ে পাড় ভেঙ্গে ফেলতে না পারে।
- প্রয়োজনে পানি চুঁয়ানো নিয়ন্ত্রণের জন্যে পলিথিন সীট ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাড়ের ঢাল মেরামত ঃ

- পুকুর পাড়ের ঢাল ভাঙ্গা থাকলে বা ঢালের গায়ে গর্ত থাকলে তা মেরামত করতে হবে। তাহলে পাড় সহজে ভাঙ্গবে না।
- পাড়ের ঢাল ২:১ অনুপাতে রাখা দরকার। এতে পাড় ভেঙ্গে পড়বে না, জাল টানা সহজ হবে এবং সঠিকভাবে মাছ আহরণ করা যাবে। এছাড়া সূর্যের আলো কার্যকরভাবে পুকুরের পানিতে পড়ায় প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে।

তলার কালো কাদা অপসারণ না করলে-

- ঘের/খামারের পানি দূষিত করে;
- চিংড়ির জন্য অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দেয়;
- তলায় বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়;
- চিংড়ির রং কালো হয়ে যায়, ফলে বাজার মূল্য কম হয়;
- উৎপাদিত মাছ বা চিংড়িতে দুর্গন্ধ আসতে পারে; এবং
- সহজেই নানা ধরণের রোগে আক্রান্ড় হয়ে মড়ক দেখা দেয়।

এক্ষেত্রে পুকুরের নির্গমন মুখের দিকে ঢালু করে তৈরী করতে হবে। বাণিজ্যিক খামারে পুকুরের মাঝে শ্রিম্প টয়লেট স্থাপন করে নির্গমন পাইপের সাথে সংযোগ দেওয়া যেতে পারে।

চাষ দেয়া ঃ তলদেশে হাল্কা চাষ দিয়ে জৈব পদার্থ খনিজায়নে সহায়তা করা যায় এবং মাটির বিষাক্ত গ্যাস অপসারণ করা যায়। অনেক সময় কষ যুক্ত মাটিতে চাষ দিলে মাটি এ্যাসিডিক হয়। যে সকল জমিতে উপরের স্ড়রে বালু বা পলি জমা হয় সেক্ষেত্রে হাল্কা চাষ উপকারী। কষযুক্ত মাটি হলে চাষ পরিহার করাই ভাল।

১০.৪.২ পুকুর পাড়ে নেট দিয়ে বেষ্টনি নির্মান ঃ

বৃষ্টির সময়, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় গলদা চিংড়ি পুকুর থেকে উঠে আসার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া অবাঞ্চিত প্রাণি, গৃহপালিত প্রাণি চিংড়ি চাষের পুকুরে যাতে না আসতে পারে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পুকুর প্রস্তুতির পূর্বে পুকুরের/ ঘেরের পাড় দিয়ে ৩ (তিন) ফুট উচু মশারীর নেট/ জাল দিয়ে বেষ্টনী (ঋবহপরহম) নির্মাণ করা প্রয়োজন। উলে- খ্য মশারীর নেট পাড়ের মাটি ৩´´ - ৪´´ গর্ত করে পুতে দেয়া উচিত। এছাড়া পুকুরের পাড়ে যাতে পাখি বসতে পারে এমন বড় গাছ রাখা যাবে না এবং পুকুরে যাতে পাখি ঢুকতে না পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য পুকুরের উপর বার্ড ফেন্সিং রাখা উচিত। বাণিজ্যিক খামারে বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য পুকুরে পাড়ে নেট স্থাপন এবং বেষ্টনি নির্মাণ আবশ্যক।

তলদেশ ধৌত করা ঃ শুকানো ও চাষের ফলে মাটির কষ, রাসায়নিক পদার্থ, ক্ষতিকর লবণ ইত্যাদি মাটির উপরে জমা হয় যা ক্ষতিকর। চাষ ক্ষেত্রে পানি উঠিয়ে দুই এক দিন রেখে তা পুনঃরায় বের করে এ সমস্ত রাসায়নিক অপসরণ করা যায় । ক্ষতিকর কষ, লবণ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে বাঁধা দেয় এবং চিংড়ির দেহের জন্যও ক্ষতিকর। ধান চাষের পর পানি উঠিয়ে রেখে তা বের করে দিলে ধানের শিকড় ও গোড়া থেকে নিঃসৃত পদার্থ অপসারণ করা যায়। তবে কাজটি করার সময় গাছের ডাল বা আচড়া দিয়ে তলদেশ আন্দোলিত করে কাল কাঁদা বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করলে তলদেশ ধৌতকরণের উদ্দেশ্য অধিক ফলপ্রসূ হবে।

১০.৪.৩ রাক্ষুষে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ ঃ

যে সমস্ত পুকুর বা ঘেরের পানি নিস্কাশন সম্ভব হয় না বা চাষ শুরু জন্য নিস্কাশনের পরে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাবে না, অথবা পুকুর বা ঘেরের অনেক সময় দেখা যায় খামার ঘের/শুকানোর পরও চাষ এলাকার নীচু জায়গায় বা নালাতে পানি জমে থাকে। এ সমস্ড় জায়গায় বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত জলজ প্রাণী বা এদের পোনা থেকে যায় যা পরবর্তীতে মজুদকৃত পোনা খেয়ে ফেলে বা খাদ্য ও বাসস্থানে ভাগ বসায়।

রাক্ষুসে বা অবাঞ্চিত মাছ দূর করার জন্য ৯.১ মাত্রার রোটেনন ৩০-৩৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য বা চা-বীজের খৈল ১৮০-২৪০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য ব্যবহার করে অনাহুত প্রাণী নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে ৬০ শক্তি মাত্রার ব্লিচিং পাউডার ২০০-৩০০ (৩০ শক্তিমাত্রার ৭৫০ গ্রাম) গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা একাধারে অবাঞ্চিত মাছ ও প্রানিকে দূর করবে এবং পুকুরকে জীবানুমুক্ত ও প্রস্তুতকালীন চুনের মাত্রা কমিয়ে আনবে। অনেক চাষী ঘেরে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করলে প্রস্তুকালী চুন ব্যবহার করেন না। তবে এক্ষেত্রে মাটি ও পানির পি এইচ পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই শ্রেয়। ব্লিচিং পাউডার সন্ধ্যার সময় প্রয়োগ করা উচিত। পুকুর শুকনো অবস্থায় ব্লিচিং প্রয়োগ করা যাবে না। মাছ বা চিংড়ি চাষকালীন ব্লিচিং ব্যবহার করা উচিত নয়, এক্ষেত্রে জৈব আয়োডিন ৫-১০ পিপিএম ব্যবহার করা যেতে পারে।

শামুক মারার জন্য তামাকের গুড়া সংগ্রহ করা যায় কিন্তু তামাকের গুড়া সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। একর প্রতি ১০০ কেজি কলি চুন ও ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট একত্রে ব্যবহার করেও শামুক,ঝিনুক,কাঁকড়া ইত্যাদি দমন করা যায়। এ ক্ষেত্রে মরা শামুক ঝিনুক তুলে ফেলতে হবে এবং পানি উঠিয়ে আবার নিষ্কাশন করে ঘের/খামার ধৌত করতে হবে। অবাঞ্ছিত প্রাণী রোধে কোন প্রকার বিষ বা কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

১০.৪.৪ ঘের/পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগ ঃ

চিংড়ি বা মাছ চাষে চুন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। চাষ শুরু থেকে শেষ সকল পর্যায়েই পানি ও মাটির গুনাগুন রক্ষার্থে চুন বা সমপর্যায়ের উপাদানসমূহ সকল চাষীরাই ব্যবহার করে থাকেন নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় ঃ

- পিএইচ বৃদ্ধি করে (ক্ষারত্ব বাড়ায়);
- উর্বরতা বৃদ্ধি করে;
- ক্যালসিয়াম যোগায় যা চিংড়ির খোলস শক্ত করতে ও বাফার অবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে;
- রোগের প্রাদুর্ভাব কমায়;
- প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থের যোগান বাড়ায়;
- নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া ও মাটিতে বসবাসকারী প্রাণীর বৃদ্ধিতে সহায়ক যা চিংড়ির স্বাভাবিক খাদ্য হয়;
- অক্সিজেন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; এবং
- পরিবেশ ভাল রাখে।

চুনের প্রকার ঃ বাজারে বিভিন্ন প্রকারের চুন পাওয়া যায় যেমন:- ক) কৃষি চুন খ) পোড়া চুন গ) ডলোমাইট ঘ) কলি চুন ইত্যাদি। কলি চুন চাষ ক্ষেত্র প্রস্তুতির সময় এবং কৃষি চুন ও ডলোমাইট খামারে চিংড়ি মজুদের পর ব্যবহার করা যায়। কলি চুন প্রয়োগে মাটি বা পানির পিএইচ হঠাৎ বেড়ে যায় যা চাষকালীন ব্যবহারের জন্য বিপদজনক। বিশেষ ব্যবস্থায় কলি চুন চাষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। চুন প্রয়োগের পূর্বে মাটি ও পানির পিএইচ পরীক্ষা করে নিম্নের ছক মোতাবেক চুনের প্রকৃতি ও পরিমান নির্ধারণ করতে হবে।

মাটিতে পিএইচ ভিত্তিক চুন প্রয়োগ এর পরিমাণ ঃ

মাটির পি,এইচ	চুন প্রয়োগের পরিমাণ (কেজি একরে)	
	কৃষি চুন বা ডলোমাইট	কলি চুন
৬.০ এর উপরে	২০০-৪০০	১০০-২০০
৫.০-৬.০	৪০০-৬০০	২০০-৩০০
৫.০ এর নীচে	৬০০-১২০০	৩০০-৫০০

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ মাটির পিএইচ ৭.০ এর নীচে থাকলেই খামারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে কলি চুন ব্যবহার করাই উত্তম। চাষক্ষেত্র শুকানোর পর সম্পূর্ণ তলদেশে এবং বাঁধের উপরে ও ঢালে চূর্ণকৃত চুন ছিটিয়ে দিতে হয় পুকুরের যে অংশে চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে এবং শুকানোর পরেও যে সকল স্থান আর্দ্র থেকে যায় সে সকল স্থানে বেশী পরিমাণে চুন প্রয়োগ করতে হয়। মাটিতে চুন গুড়া/চূর্ণ অবস্থায় দিতে হয়, চাষকালীন সময় চুন পানিতে গুলে সমগ্র পানি এলাকায় প্রয়োগ করতে হয়।

১০.৪.৫ চাষ ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে পানি উত্তোলন ঃ

পুকুর/ঘেরে পানি উঠানোর প্রয়োজন হলে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যতিত নদী বা খালের পানি অবশ্যই প্রতি ইঞ্চিতে ৬০ ছিদ্র বিশিষ্ট মেস সাইজের নেট দিয়ে ছেঁকে তুলতে হবে। প্রথমবারে ২০ সেঃ মিঃ পানি ছেকে তুলতে হবে এবং পরবর্তী প্রতিবারে ১০ সেঃমিঃ করে পানি তুলে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত হয়ে করা যায়। কমপক্ষে ৬০ সেঃমিঃ পানি উত্তোলনের পর প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন নিশ্চিত হয়ে পোনা মজুদ করতে হবে। বাণিজ্যিক খামারে রিজার্ভ পুকুরে পানি তুলে থিতিয়ে ৩০ পিপিএম ব্লিচিং দিয়ে জীবানু মুক্ত করে ছেঁকে মজুদ পুকুরে ব্যবহার করা উচিত।

বাণিজ্যিক গলদা চিংড়ি চাষের জন্য একটি আদর্শ পুকুর হবে আয়তাকার, ০.৫-১.০একর আয়তন বিশিষ্ট; গভিরতা ২.০-২.৫ মিঃ যাতে পুকুরে ১.৫-২.০ মিটার পানি থাকতে পারে। পুকুরে পানি প্রবেশ এবং নিস্কাশনের ব্যবস্থা সহ পানি নির্গমণের দিকে তলা ঢালু থাকা উচিত। পুকুরের তলা রোদ্রে শুকাতে হবে এবং ৬ ইঞ্চি গভির করে চাষ দিতে হবে। তলার মাটির পি এইচ ৬.৫ নীচে থাকলে চুন প্রয়োগের মাধ্যমে তা ৬.৮ করা উচিত। তবে কষযুক্ত মাটি প্রয়োজন না হলে চাষ না দেওয়াই ভাল। চাষ শুরুর পর্বে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পুকরের তলা শোধন করে নিতে হবে।

১০.৪.৬ আশ্রয়স্থল স্থাপন ঃ

খোলস বদলের সময় চিংড়ি দূর্বল থাকে। তখন এদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। কারণ সব চিংড়ি একই সময়ে খোলস বদলায় না। এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যে গুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দূর্বলগুলোকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। এ ছাড়া ও তাল বা নারিকেলের শুকনা পাতা, বাঁশের কঞ্চি, ভাঙ্গা প্লাষ্টিকের পাইপ, ভাঙ্গা কলসের টুকরা ব্যবহার করে চিংড়ির আশ্রয়স্থল তৈরী করে দেয়া যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের গুরুত্ব ঃ

- খোলস পরিবর্তনের সময় নরম চিংড়িকে তার স্বজাতির বা অন্যান্য মাছের হাত থেকে রক্ষা করে।
- চুরির হাত হতে চিংড়িকে রক্ষা করে।
- উচ্চ তাপমাত্রা থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে।
- পরিফাইটন জন্মাতে সাহায্য করে।

আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশল ঃ শুকনো তাল বা নারিকেলের পাতা ঘেরের তলায় সমান্তরালভাবে অথবা কাত করে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে পাতার অংশ মাটি থেকে একটু উপরে থাকে। বাঁশের কঞ্চি অনেকগুলো একত্রে আটি বেধেঁ অথবা প্লাষ্টিকের পাইপের খন্ড বা মাটির তৈরী ছোট কলস পুকুরের তলায় মাটির উপর রেখে দিতে হবে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের পরিমাণ ঃ শুকনো তাল বা নারিকেলের পাতা প্রতি ২ শতাংশে ১-২ টি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। অন্যান্য বস্তুগুলো আনুপাতিক হারে ব্যবহার করতে হবে। তবে নার্সারীতে মজুদ ঘনত্ব (>২০০০/শতাংশ)বাড়াতে হলে আশ্রয়স্থল অন্তত মোট আয়তনের ১০% জায়গায় হওয়া উচিত।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সময় ঃ পিএল বা জুভেনাইল মজুদের ১-২ দিন আগে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সতর্কতা ঃ

- কোন অবস্থাতেই কাঁচা পাতাসহ ডাল বা কঞ্চি পুকুরে দেয়া যাবে না।
- কয়েক মাস পর পর ডাল বা কঞ্চি তুলে শুকিয়ে পুনরায় ঘের/পুকুরে দিতে হবে।

গলদা চিংড়িচাষের পুকুরে অবশ্যই পর্যাপ্ত (১-২% জায়গায়) আশ্রয়স্থল স্থাপন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কাঁচা নারকেলের পাতা বা বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করা যাবে না।

১০.৪.৭ প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী ঃ

- প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য খামারে নিয়মিত ও পরিমিত সার প্রয়োগ করতে হয়।
- একর প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া ও ১ কেজি টিএসপি পানিতে দিতে হবে । টিএসপি ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। সার প্রয়োগের সময় টিএসপি এবং ইউরিয়া পানিতে গুলে ঘেরে/খামারে প্রয়োগ করতে হবে।
- ৭ - ১০ দিন প্রতিদিন পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হবার আগ পর্যন্ড় একইভাবে সার দিতে হবে;
- সার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে প্রদান করতে হয়;
- সার প্রয়োগের সাথে সাথে পানির গভীরতা ৬০ সেঃ মিঃ থেকে ক্রমান্বয়ে গড়ে ১.০০-১.২০ মিটার করতে হবে;
- সার প্রয়োগের পর পানি পরিবর্তন করা যাবে না;
- যদি পানির রং সবুজ/বাদামী হয় তবে ধরে নেয়া যায় পানিতে প- াংকটন (প্রাকৃতিক খাদ্য) উৎপন্ন হয়েছে এবং পোনা ছাড়ার জন্য উপযুক্ত;

- সার প্রয়োগে পানির রং সবুজাভ না হলে অন্য জলাশয় থেকে উদ্ভিদকণা (ফাইটোপ- াংকটন) এনে চাষ ক্ষেত্রে দিতে হবে। এবং পুনরায় একই পরিমাণে সার একইভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

  অথবা

  পোনা ছাড়ার উপযোগী বা পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী করতে একর প্রতি ৫ কেজি মিহি চালের কুড়া ও ৫ কেজি চিটাগুড় ৫০ গ্রাম ইষ্ট সহযোগে ২৪-৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

১০.৫ পি এল মজুদ ঃ

১০.৫.১ ভাল মানের পি এল সনাক্ত ও সংগ্রহ ঃ

শুধু সঠিক সংখ্যায় পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলেই ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে না। বেশী উৎপাদন পাওয়ার জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্বের পাশাপাশি ভাল মানসম্পন্ন সুস্থ সবল পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। পিএল বা জুভেনাইলের উৎস এবং পরিবহন পি এল এর গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। পি এল এর গুনগত মান মজুদকালীন মৃতুহার ও বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলে।

সে কারণে পুকুরে মজুদের পূর্বে পোনার যথাযথ গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ভাল পি এল এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহ বিদ্যমান থাকবে-

- দেহ নীলাভ-সাদা/ছাই রংয়ের, খারাপ জুভেনাইল লালচে/ কালচে;
- এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভাঙ্গা থাকে না;
- খোলস পরিষ্কার কিন্তু খারাপ জুভেনাইলের খোলস কালচে ও শেওলাযুক্ত;
- খাদ্য থলি পরিপূর্ণ, তবে খারাপ জুভেনাইলে খাদ্য থলি আংশিক পরিপূর্ণ বা খালি থাকে; এবং
- পাত্রে কিছু পি এল নিয়ে স্রোত সৃষ্টি করলে স্রোতের বিপরীতে চলার চেষ্টা করে, দূর্বল পোনা হলে পাত্রের মাঝখানে জমে থাকবে।

পি এল এর অধিক বেঁচে তাকার হার নিশ্চিত করার জন্য পি এল-১০ বা তদুর্ধ্ব আকারের রোগ মুক্ত, একই আকারের এবং দৈহিক বিকলঙ্গতা বিহীন পোনা ৩০-৪৫ দিন নার্সারী পুকুরে পালন করে মজুদ পুকুরে জুভেনাইল মজুদ করা উচিত। নার্সারী পুকুরের পি এল পালন পদ্ধতি পরিশিষ্ট-১ এ আলোচনা করা হয়েছে।

১০.৫.২ মজুদ ঘনত্ব ঃ

পুকুরে শুধুমাত্র সার ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু কম এবং সার ও খাদ্য দুই-ই ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু বেশী হতে পারে। আবার জলাশয়ে আংশিক পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকলে আরও অধিক ঘনত্বে মজুদ করা যেতে পারে। কোন পুকুরে পোনার মজুদ ঘনত্ব ও মজুদ হার পুকুরের পানি-মাটির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলী ও চাষ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল।

কার্প-গলদা মিশ্র চাষে প্রতি শতাংশে মজুদ ঘনত্ব ঃ

প্রজাতি	নমুনা-১ (সংখ্যা)	নমুনা-২ (সংখ্যা)	নমুনা-২ (সংখ্যা)	মন্তব্য
গলদা জুভেনাইল (৩-৫ গ্রাম)	৪০-৫০	৬০-৮০	২০-২৫	
সিলভার কার্প (৮০-১০০ গ্রাম)	১.৫-২	-	৪-৫	
কাতলা (১০০-১৫০ গ্রাম)	০.৫-১	২-৩	৩-৪	
রুই (৮০-১০০ গ্রাম)	০.৫-১	-	৪-৫	
গ্রাসকার্প (১০০-২০০ গ্রাম)	১-২	১-২	১-২	

প্রতিক্ষেত্রে পানির গভিরতা ১.৫-২.০ মিটার বজায় রাখতে হবে। গলদা ও রুইয়ের মোট ওজনের ৫-২% হারে প্রতিদিন ২ বার সকল এবং সন্ধ্যায় সম্পুরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। চাষকালীন সময়ে সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন বজায় রাখতে হবে।

বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে গলদা চাষে প্রতি শতাংশে মজুদ ঘনত্ব ঃ

প্রজাতি	নমুনা-১ (সংখ্যা)	নমুনা-২ (সংখ্যা)	মন্তব্র
গলদা জুভেনাইল (৩-৫ গ্রাম)	১০০-১২০	১১০-১৪০	বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকলে ১৬০-২৪০ টি গলদা জুভেনাইল প্রতি শতাংশে মজুদ করা যায়
সিলভার কার্প (৮০-১০০ গ্রাম)	১-২	-	
কাতলা (১০০-১৫০ গ্রাম)	২-৩	৩-৪	

প্রতিক্ষেত্রে পানির গভিরতা ১.৫-২.০ মিটার বজায় রাখতে হবে। গলদা মোট ওজনের ৫-২% হারে প্রতিদিন ২ বার সকল এবং সন্ধ্যায় খাবার প্রয়োগ করতে হবে। চাষকালীন সময়ে সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন বজায় রাখতে হবে। পুকুরের পাশাপাশি ধান ক্ষেতে ১০-১৫% জায়গায় চারিধারে নালা বা একপাশে গর্ত করে রোরো মৌসুমের শেষে ধান কাটার পর চৈত্র-বৈশাখ মাসে গলদার পি এল নালা বা গর্তে নার্সিং করা হয় এবং একই সাথে উপরের জমি পরিস্কার করে চুন প্রয়োগ করে প্রস্তুত করা হয়। আষাঢ-শ্রাবন মাসে পানি বৃদ্ধি পেলে কার্প জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করা হয় এবং গলদা চিংড়ির জন্য উপরোল্লিখিত হারে খাবার প্রয়োগ করা হয়। বাগেরহাট জেলাতে ধান ক্ষেতে এই চাষপদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

গলদা-বাগদা-কার্প মিশ্র চাষে প্রতি শতাংশে মজুদ ঘনত্ব ঃ

প্রজাতির নাম	নমুনা-১ (সংখ্যা)	মন্তব্য
বাগদা পি এল	৮০-১০০	
গলদা জুভেনাইল (৩-৫ গ্রাম)	১০০-১২০	
কাতলা (১০০-২০০ গ্রাম)	৩-৪	
রুই রুই (৮০-১০০ গ্রাম)	১-২	

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে মৃদু লবণাক্ত পানির (৫-১০ পিপিটি) এলাকায় ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পুকুর প্রস্তুত করে নার্সিং করা বাগদার পি এল মজুদ করা হয়। বাগাদা ২-৩ মাস চাষ করা হয় আংশিক আহরণ সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর পানির লবনাক্ততা কমে আসলে গলদার জুভেনাইল মজুদ করা হয় এবং পানির গভিরতা বাড়িয়ে কার্প জাতীয় মাঝের পোনা মজুদ করা হয় কার্তিক-অগ্রায়ন মাস থেকে গলদার আহরণ শুরু করা হয় এবং মাঘ-ফাল্গুন মাসে সম্পূর্ণ আহরণ করা হয়। খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা অপেক্ষকৃত কম লবণাক্ত প্রবন এলাকায় এই চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চাষীগণ একাধিকবার পোনা মজুদ করায় এবং লবণাক্ততার পরিবর্তনের কারনে বাগদা পি এল এর মৃত্যু হার বেশী হয়।

১০.৫.৩ পি এল পরিবহন ঃ

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে কার্প জাতীয় মাছের রেণু ও চিংড়ির পিএল এবং সনাতন পদ্ধতিতে ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়িতে চিংড়ির জুভেনাইল ও মাছের চারা পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে। তবে সুযোগ থাকলে আধুনিক পদ্ধতিতে চারা পোনা ও জুভেনাইল পরিবহনও অধিক নিরাপদ। সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহনকালে ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং পাত্রের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, এমন কি ব্যাপক হারে পোনা মারা যেতে পারে। পক্ষান্ড়রে অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকালে অক্সিজেনের অভাব হয় না ও পোনার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সে কারণে সনাতন পদ্ধতিতে পোনা ও জুভেনাইল পরিবহনে অধিক সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

পোনা পরিবহন ঘনত্ব ঃ

পরিবহন ঘনত্ব মূলতঃ নির্ভর করে পিএল, জুভেনাইল ও চারা পোনার আকার, ওজন এবং পরিবহন দূরত্বের উপর। সাধারণভাবে ৩৬''ী ২০'' আকারের পলিথিন ব্যাগ পিএল বা পোনা পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। চিংড়ির পোনার আকার ও দুরত্বের ওপর ভিত্তি করে পরিবহন ঘনত্ব নিম্নরুপ

পোনার আকার/ধরণ	পরিবহন ঘনত্ব/লিটার	পরিবহন সময় (ঘন্টা)	পরিবহন পদ্ধতি
পোষ্ট লার্ভা-২০	৫০০-১০০০	১২-১৬	অক্সিজেনসহ পলি ব্যাগ
পোষ্ট লার্ভা-৩০-৩৫	৩৫০-৫০০	৬	-ঐ-
জুভেনাইল (৫-৭ সে:মি:)	১০-২০	৩-৬	-ঐ-

১০.৫.৪ পি এল খাপ খাওয়ানো ও অবমুক্তকরণ ঃ

উচ্চতর বা নিম্নতর তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও পিএইচ চিংড়ির আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হতে পারে অথবা চিংড়ির মাঝে পীড়ণ/ক্লেশ সৃষ্টি করে রোগ সংক্রমনের কারণ ঘটাতে পারে।

তাপমাত্রাঃ তাপমাত্রা অত্যাধিক কমে গেলে এনজাইমের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়, রক্তের হিমোলিম্ফ জমে যায়, কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় অথবা লোপ পায় এবং বিপাক বিঘ্নিত হয়। আবার তাপমাত্রা অত্যাধিক বেড়ে গেলে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায়। দেহের চর্বি, প্রোটিন এবং এনজাইম ভেঙ্গে যায়। এ অবস্থা রোধের জন্য পরিবহনকৃত পাত্রের পানি ও পুকুরের পানির তামাত্রার পার্থক্য **১**° সেঃ এর বেশী থাকা উচিত নয়। তাপমাত্রা সমতায় আনার ক্ষেত্রে ঘন্টায় **১.৫**° সেঃ এর বেশী বাড়ানো বা কমানো ঠিক নয়।

লবণাক্ততা ঃ বাগদার অসমোরেগুলেশান ও পরিপার্শিক লবণাক্ততার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। লবণাক্ততা বাড়ার সাথে সাথে অসমোরেগুলেশন বেড়ে যায় এর ফলে দেহের অভ্যন্ড়রস্থ তরল পদার্থের পরিবর্তন ঘটে যা তাদের মৃত্যুর কারণ। বাগদার লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা বিস্ড়ৃত হলেও সমতায় আনার ক্ষেত্রে ঘন্টায় তা কমানোর হার ৩ পিপিটির বেশী এবং বাড়ানোর হার ১ পিপিটির বেশী হওয়া ঠিক নয়। পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির মধ্যকার এ পার্থক্য ২ পিপিটির মধ্যে থাকা উচিৎ।

পিএইচ ঃ সমতায় আনার ক্ষেত্রে পিএইচ এর তারতম্য ঘন্টায় ০.৫ এর কম বেশী হওয়া ঠিক নয়।

পরিবেশের তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের তারতম্যের কারণে মজুদের পর পিএল ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে। পুকুরে ছাড়ার আগে এদেরকে নতুন পরিবেশের সাথে সহনশীল করে নিলে এ মৃত্যু হার অনেকাংশে রোধ করা যায়। পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা, পি এইচ ও লবণাক্ততার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সমতা আনয়নই হচ্ছে পরিবেশ সহনশীলকরণ বা খাপ খাওয়ানো। নতুন পরিবেশের সাথে সহনশীল করে নার্সারিপুকুরে পিএল ছাড়ার ধারাবাহিক কাজগুলো নিরূপ-

- নার্সারিপুকুর পাড়ে পিএল এর ব্যাগের ভিতর দুই প্যাকেট ওরস্যালাইন বা ১০০ গ্রাম গ- ুকোজ দিতে হয়।
- যে পাত্রেই পরিবহন করা হোক না কেন তা ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে
- পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তলার অপেক্ষকৃত ঠান্ডা পানি হাত দিয়ে ওপরে তুলে পলিথিন ব্যাগের ওপর বৃষ্টির মতো ছিটাতে হবে।
- এর পর হাত দ্বারা পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই অবস্থায় পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২° সে এর বেশি না হয়।
- পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পি এইচ সমান না হওয়া পর্যন্ড় আস্ড়ে আস্ড়ে পাত্র ও পুকুরের পানি অদল-বদল করে পানির তাপমাত্রা সমতায় আনতে হবে।
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ, সবল পিএল স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাবে।

পরিবহনকালীন সর্তকতা ঃ

- ব্যাগে যাতে কোন প্রকার চাপ না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- পরিবহন পাত্র ভেজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে
- পরিবহনকালে ব্যাগ/পাতিল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে
- ব্যাগে যাতে টিনের টুকরা, পেরেক বা অন্য কোন শক্ত বস্তুর আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- একই ব্যাগ বা পাত্রে সমান আকারের পিএল পরিবহন করতে হবে
- পানি ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতি ঘণ্টা পরিবহন দূরত্বে লি. প্রতি ১০ গ্রাম হারে বরফ ব্যবহার করতে হবে।

১০.৫.৫ পি এল মজুদ ঃ

পিএল/জুভেনাইল ও মাছের পোনা ছাড়ার সময় ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোন সময়ে পুকরে মাছের পোনা ছাড়া যায়। তবে সকাল অথবা বিকালে পোনা ছাড়াই উত্তম। দুপুরের রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় (বিশেষতঃ নিুচাপের দিনে) পুকুর বা ঘেরে মাছের পোনা বা পিএল বা জুভেনাইল ছাড়া উচিত নয়। পিএল বা জুভেনাইল ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় ধরে খাপ খাওয়াতে হবে।

হ্যাচারী থেকে রোগমুক্ত পি এল ক্রয় করে নার্সারী পুকুরে ৩০-৪৫দিন লালন করে মজুদ পুকুরে জুভেনাইল মজুদ করা উচিত। পুরুষ গলদা স্ত্রী গলদার চেয়ে দ্রুত বড় হয় বিধায় মজুদ পুকুরে শুধুমাত্র পুরুষ গলদা চিংড়ি মজুদ করা গেলে উৎপাদন বেশী হয়।

১০.৬ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

১০.৬.১ গলদা চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা ঃ

সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকা ও দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের খাদ্যেও সুষম খাবারের সবগুলো উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু এ সব খাদ্য উপাদানের মধ্যে আমিষ সবচেয়ে বেশী মাত্রায় প্রয়োজন। সে কারণে মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা বলতে সাধারণভাবে আমিষের চাহিদাকে বুঝানো হয়। মাছের খাদ্য তৈরীতে যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর প্রত্যেকটিতে খাদ্যের অন্যান্য উপাদান যেমন শর্করা, চর্বি ও খনিজ লবণ বিদ্যমান থাকে। সে কারণে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। গলদা চিংড়ির জীবর চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে এই পুষ্টি মানের চাহিদা বিভিন্ন রকম। যেমন ঃ

পুষ্টি উপাদান	জীবন চক্রের পর্যায়	পরিমান
আমিষ (%)	ব্রুড চিংড়ি	৩৮-৪০
	পি এল (২ মাস পর্যন্ত বয়স)	৩৮-৪০
	জুভেনাইল (২-৪ মাস বয়স)	৩৫-৩৭
	পূর্ণবয়স্ক (৫-৬ মাস বয়স)	২৮-৩০
শর্করা (%)	জীবন চক্রের সকল পর্যায়	২৫-৩৬
লিপিড (%)	জীবন চক্রের সকল পর্যায়	৩-৭
অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এ্যাসিড (%)	জীবন চক্রের সকল পর্যায়	০.০৪
কোলেস্টরল (%)	জীবন চক্রের সকল পর্যায়	০.৫-০.৬
ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম/কেজি)	পূর্ণবয়স্ক (৫-৮ মাস বয়স)	১০০
ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম/কেজি)	জীবন চক্রের সকল পর্যায়	১.৫-২
ফসফরাস (মিঃ গ্রাম/কেজি)	জীবন চক্রের সকল পর্যায়	১
জিংক (মিঃ গ্রাম/কেজি)	জীবন চক্রের সকল পর্যায়	৯০
শক্তি (কিলোক্যালরি/গ্রাম)	ব্রুড চিংড়ি	৩.৭-৪.০
	অন্যান্য পর্যায় সমূহে	২.৯-৩.২

তবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা থাকলে ২০-২৫% আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগে সন্তোষজনক বৃদ্ধি পাওয়া যায়।

১০.৬.২ খাদ্য তৈরী ঃ

মাছ বা চিংড়ির খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ণয়ে শুধুমাত্র আমিষের মাত্রা হিসেব করা হয়। সাধারণ ঐকিক নিয়মে একাধিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরী খাদ্যের পুষ্টিমান সহজেই নিরূপণ করা যায়। নীচে একটি উদাহরণের সাহায্যে খাদ্যে আমিষের মাত্রা নিরূপণ পদ্ধতি দেখানো হলো। ধরা যাক ফিশমিল, সরিষার খৈল, গমের ভুষি এবং বাইন্ডার হিসেবে আটা ব্যবহার করে ১ কেজি খাদ্য তৈরী করা হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের অনুপাত হবে ফিসমিল ২৫%, সরিষার খৈল ২৫%, গমের ভুষি ৪০% এবং আটা ১০%। তাহলে এ সমস্ত উপকরণগুলো ব্যবহার করে তৈরী খাদ্যে আমিষের মাত্রা হবে-

উপকরণ	বিদ্যমান আমিষের পরিমান (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	প্রয়োজনীয় পরিমান (গ্রাম)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল	৫৬.৬১	২৫	২৫০	১৪.১৫
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	২৫	২৫০	৮.৩৩
গমের ভুষি	১৪.১৭	৪০	৪০০	৫.৮২
আটা	১৭.৭৮	১০	১০০	১.৭৮
খনিজ লবণ	-	-	১ চা চামচ	-
ভিটামিন প্রিমিক্স			১০০ কেজি খাবারে ১ চা চামচ	-
মোট		**১০০**	**১০০০**	**৩০.০৮**

অতএব, উল্লেখিত খাদ্যে আমিষের মাত্রা হচ্ছে ৩০.০৮%

খাদ্য তৈরীতে উপকরণ ব্যবহারের অনুপাত ঃ

উপকরণ মাছ ও চিংড়ির খাদ্য তৈরীর জন্য কম মূল্যের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য উপকরণ এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে এদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং খাদ্য প্রয়োগ বাবদ পুঁজি বিনিয়োগ কম হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত খাদ্য উপকরণ যেমন- খৈল, কুড়া, গমের ভুষি, ফিসমিল, আটা, চিটাগুড় ইত্যাদি ব্যবহার করেই মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা পূরনে সক্ষম এমন সম্পূরক খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে। নীচে চাষীর আর্থিক সামর্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা বিবেচনা করে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য তৈরীতে উপকরণ ব্যবহারের নমুনা উলে-   খ করা হলো-

উপাদানের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা(%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য	ব্যবহার মাত্রা(%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য
ফিসমিল	৩০	৩০০	৩০	৩০০
সরিষার খৈল	৪০	৪০০	৩০	৩০০
হাড়ের গুড়া	-	-	৫	৫০
পলিস কুড়া/গমের ভুষি	২০	২০০	২০	২০০
আটা	৯	৯০	১০	১০০
চিটাগুড়	১	১০	৫	৫০
খনিজ লবণ	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামচ
ভিটামিন প্রিমিক্স	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামচ
মোট	**১০০**	**১০০০**	**১০০**	**১০০০**

সম্পূরক খাদ্য তৈরী ঃ

বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই মাছ ও গলদা চিংড়ির খাদ্য তৈরী করা যায়। চাষী নিজের হাতেই তা করতে পারেন। সম্ভব হলে পিলেট মেশিন ব্যবহার করেও খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে। নীচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য মিশ্র খাদ্য তৈরীর পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

- সরিষার খৈল কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে ভাসমান তৈলযুক্ত পানি ফেলে দিয়ে খাবারে ব্যবহার করতে হবে কারন সরিষার খৈইলে মানুষের দেহে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এলাইল আইসো থায়ো সায়ানেট থাকে যা ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে গ্যাস আকারে চলে যায়।
- চালের কুঁড়া, ভুষি ও ফিসমিল ভালভাবে চালুনি দ্বারা চেলে নিতে হবে
- চালের খুদ ব্যবহার করা হলে সিদ্ধ করে নিতে হবে
- সমস্ড় উপকরণগুলো একটি পাত্রে নিয়ে ভালভাবে মেশাতে হবে
- আটা পরিমান মত পানিতে ফুটিয়ে আঠালো পদার্থ তৈরী করতে হবে
- উপকরণগুলো আঁঠালো পদার্থ দ্বারা মেখে কাঁই তৈরী করে ছোট ছোট বল বানাতে হবে।
- বল সমূহ মেশিনে দিয়ে পিলেট বাঁনিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে বায়ুরোধী প্লাষ্টিকের ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে।
- এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত খাবার ১ সপ্তাহের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

খেয়াল রাখতে হবে বাসি বা পচাঁ কোন উপকরণ যেন খাদ্যে না ঢোকে। বর্ষা মৌসুমে খাবারে ছত্রাক হওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাই খাবার শুকনো রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

সম্পুরক খাদ্য ক্রয়ের সময় নিম্নের বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হবে ঃ

- খাদ্র বিক্রেতার মৎস্র অধিদপ্তরের হাল নাগাদ লাইসেন্স।
- খাবারের প্যাকেটের গায়ে খাদ্যের পুষ্টি উপাদনের তথ্যাবলী।
- খাদ্রের উৎপাদন ও মেয়াদ উর্ত্তীণ তারিখ ।
- খাদ্য উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

১০.৬.৩ খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের হার নির্ভর করে মূলতঃ পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়ের উপর। বড় মাছ ও চিংড়ির চেয়ে ছোট অবস্থায় এদের খাদ্য চাহিদা অনেক বেশী। সে কারণে উৎপাদন পুকুরে প্রথম দিকে বেশী মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করতে হয়। তবে মাছ ও চিংড়ি বড় হওয়ার সাথে সাথে খাদ্য প্রয়োগ হার কমে গেলেও মোট খাদ্যের পরিমান তুলনামূলক ভাবে বেড়ে যায় । নীচের সারণীতে উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থাপনায় মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের নমুনা মাত্রা উলে-   খ করা হলো-

পিএল মজুদ করা হলে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ড় বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানীর স্টার্টার ফিড (৩৮-৪০% আমিষ সমুদ্ধ)

১ম সপ্তাহ ২০ গ্রাম/১০০০ পিএল

২য় সপ্তাহ ৪০ গ্রাম/১০০০ পিএল

৩য় সপ্তাহ ৬০ গ্রাম/১০০০ পিএল

৪র্থ সপ্তাহ ৮০ গ্রাম/১০০০ পিএল।

নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হারে মজুদকৃত গলদার জুভেনাইলকে সকাল ও সন্ধ্যায় মোট খাবার ২ভাগ করে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন (গ্রাম)	মজুদকৃত জুভেনাইলের মোট ওজনের %
৫-১০	৮
১০-২০	৫
২০-৩০	৪
৩০-৪০	৩
>৪০	২

তবে কম্পানীভেদে খাদ্য প্রয়োগের এই মাত্রায় তারতম্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের প্যাকেটে রক্ষিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করা যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগ ঃ

মাছ দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহন করে। অপর দিকে গলদা চিংড়ি নিশাচর। দিনের আলোর চেয়ে এরা অন্ধকারে চলাচল ও খাদ্য গ্রহন করতে পছন্দ করে। সে জন্যে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকাল ৬ টার আগে এবং আরেকবার সন্ধ্যা ৬ টার পরে প্রয়োগ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার প্রয়োগের পূর্বে খাবারকে আবার দু'ভাগ করে অর্ধেক খাদ্যদানীতে এবং বাকী অর্ধেক পুকুরের কয়েকটি জায়গা পাটকাঠি দ্বারা চিহ্নিত করে সেখানে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে চিংড়ির জন্য খাদ্য দেয়ার সময় পুকুরের তলদেশ থেকে এক ফুট উপরে খাদ্যদানী স্থাপন করতে হবে। খাদ্যদানী (ট্রে) তে খাবার দিলে খরচ বাঁচে এবং খাদ্যের ব্যবহার যথার্থ হয়। তাছাড়া খাদ্যের পরিমাপ করাও সহজ হয়।

খাদ্যদানী তৈরী ঃ

এটির আকার ১ বর্গ মিটার অথবা ৮০ী ৮০ সেমি হতে পারে। বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমের নীচে মশারীর কাপড় লাগিয়ে ধর্ম জালের মতো করে তা তৈরী করা যায়। ফ্রেমটির উচ্চতা ১০ সেমি রাখা উচিত। ৩০ শতাংশ পুকুরে ২টি, ৬০ শতাংশ পুকুরে ৪টি এবং ১০০ শতাংশে ৬ টি খাদ্যদানী স্থাপন করলেই চলে। খাদ্যদানী ব্যবহার করা হলে তা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগের সতর্কতা ঃ

- প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- খাদ্য প্রয়োগের ২ ঘন্টা পর খাদ্য দানী উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং খাবার গ্রহনের পরিমান যাচাইপূর্বক প্রয়োগ মাত্রা পুনরায় নির্ধারণ করতে হবে

খাদ্যে সরিষার খৈল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে ভাসমান তৈলযুক্ত পানি ফেলে দিয়ে খাবারে ব্যবহার করতে হবে কারন সরিষার খৈইলে মানুষের দেহে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এলাইল আইসো থায়ো সায়ানেট থাকে যা ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে গ্যাস আকারে চলে যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় ও চাহিদার অতিরিক্ত আমিষ সমৃদ্ধ খাবার ব্যবহার করা যাবে না কারন অতিরিক্ত খাদ্য ও আমিষ পানির গুনগত মান নষ্ট মাছ ও চিংড়ির রোগ সৃষ্টি করে। খাদ্য উপাদার ও মাছের খাদ্যে যেন কোন ভাবেই ছত্রাক না ধরে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে কারন এটি মাছের খাবারে মাইকোটক্সিন উৎপাদন করে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে খাদ্য উপাদান ও খাবারের আদ্রতা ১৪% এর নীচে রাখা উচিত। প্রতিদিন খাবার দিতে হবে, কোন ভাবেই কয়েকদিনের খাবার এক সাথে পুকুরে

- পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- কোনভাবেই অতিরিক্ত খাবার প্রদান করা যাবে না।

১০.৭ চাষকালীন ব্যবস্থাপনা ঃ

১০.৭.১ প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

পুকুর বা ঘেরের প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য সেকি ডিক্স দৃশ্যমানতা ৩০-৪০ মধ্যে রাখতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য পোনা ছাড়ার উপযোগী বা পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী করতে একর প্রতি ৫ কেজি মিহি চালের কুড়া ও ৫ কেজি চিটাগুড় ৫০ গ্রাম ইষ্ট সহযোগে ২৪-৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনে একর প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া ও ১ কেজি টিএসপি পানিতে দিতে হবে । টিএসপি ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। সার প্রয়োগের সময় টিএসপি এবং ইউরিয়া পানিতে গুলে ঘেরে/খামারে প্রয়োগ করতে হবে।

১০.৭.২ পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

পানির গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য পানির পিএইচ, দ্রবীভুত অক্সিজেন, ক্ষারতা, এ্যামোনিয়াসহ অন্যান্য বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং এগুলোর কোনটার মান সহনশীল মাত্রায় না থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। পিএইচ দ্রবীভুত অক্সিজেন, ক্ষারতা, এ্যামোনিয়াসহ ও গুনাগুন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য চিংড়ির পুকুরে পাক্ষিকভাবে প্রতিশতাংশে ১০০ গ্রাম হারে জিওলাইট এবং ২০০ গ্রাম হারে ডলোমাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।

পিএইচ ঃ বাণিজ্যিক খামার সমূহে ভোর ৫টায় এবং বিকাল ৪ টায় দিনে ২বার পি এইচ পরীক্ষা করা উচিত। দিরে পি এইচ এর উঠানামা ০.৫ এর বেশী হওয়া উচিত নয়। পি এইচ এর দ্রুত উঠানামায় চিংড়ি দূর্বল হয়ে যায় এবং রোক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে উঠানামা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরপর ৩দিন প্রতি শতাংশে ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি হারে ডলোমাইট প্রয়োগকরা যেতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত পি এইচ বেড়ে গেলে প্রবায়োটিক (ব্যাসিলাস প্রজাতি) ব্যবহার করা যেতে পারে এবং পানির গভিরতা ১.৫ -২.০ মিঃ রাখতে হবে, পানির গভিরতা পি এইচ ও অক্সিজেনের এর দ্রুত উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে।

অক্সিজেন ঃ পুকুরের মাছ বা চিংড়ি ভেসে উঠলে বা খাবি অক্সিজেনের ঘাটতি অনুমিত হয়। বাণিজ্যিক খামার সমূহে ভোর ৫টায় এবং বিকাল ৪ টায় দিনে ২বার অক্সিজেন পরীক্ষা করা উচিত। পুকুর বা ঘেরের অক্সিজেন < ৩পিপিএম হলে পানি অক্সিজেন সরবরাহকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার অথবা এ্যায়ারেটর চালানোর ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। পানির গভিরতা ১.৫-২.০ মিঃ এবং পি এইচ ৭.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

অ্যামোনিয়া ঃ অআয়নিত অ্যামোনিয়া চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর। পি এইচ নেমে গেলে অআয়নিত অ্যামোনিয়া বিষাক্ততার মাত্রা বেড়ে যায়। মাত্রাতিরিক্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ব্যবহার, অতিরিক্ত খাবার ব্যবহার,পানিতে অক্সিজেন কমে এবং পুকুর প্রস্তুতের সময় পুকুরের তলা সঠিকভাবে অপসরণ না করা হলে পুকুরে অ্যামোনিয়ার সমস্য সৃষ্টি হয়। অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণে প্রবায়োটিক অথবা জিওলাইট ব্যবহার, পানি পরিবর্তন করে অ্যামোনিয়ার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

বাণিজ্যিক খামারে চাষকালীন পুকুরে গুনগত মান রক্ষার্থে নিয়মিত পুকুরের পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন পরীক্ষা করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। কাঙ্খিত মাত্রার বাইরে গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। চাষকালীন পাক্ষিকভাবে প্রতিশতাংশে ১০০ গ্রাম হারে জিওলাইট এবং ২০০ গ্রাম হারে ডলোমাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। মাছ বা চিংড়ি ভেসে ওঠা বা খাবি খাওয়ার পর অক্সিজেন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন মাছের উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং সে জন্য নিয়মিত অক্সিজেন পরিমাপ করতে হবে।

১০.৮ আহরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা, গ্রেডিং, বাজারজাতকরণ এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

খাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে পুকুর হতে মাছ ও চিংড়ি ধরাই হচ্ছে আহরণ। লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতিতে আহরণ অপরিহার্য। পুকুর হতে দু'ভাবে মাছ আহরণ করা যায়। যেমন- ১.আংশিক আহরণ ২.সম্পূর্ণ আহরণ। প্রত্যেক পুকুরের একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা থাকে। ধারণ ক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গেলে সে পুকুরে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন হার কমে আসে। অথচ পুকুরে তখনও সার ও খাদ্য প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হয়। ফলে চাষী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। পুকুরের ধারণ ক্ষমতা পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি বড় মাছ ও চিংড়িগুলো ধরে ফেলা হয় তবে বাকিগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পায় এবং এতে সার্বিক উৎপাদনও বেশী হয়। সে কারণে সুযোগ থাকলে মাছ ও চিংড়ির আংশিক আহরণই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। এ ছাড়াও আংশিক আহরণে চুরি ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি অনেক কমে যায় এবং সময় মত বিক্রি করে ভাল বাজার মূল্যও পাওয়া যায়। তবে আংশিক বা সম্পূর্ণ যে কোন পদ্ধতিতেই আহরণ করা হোক না কেন মাছ ও চিংড়ি আহরণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

- মাছ ও চিংড়ির আকার এবং ওজন
- মাছ ও চিংড়ির মোট জীবভর
- বাজার মূল্য
- ঝুঁকি
- পুনঃমজুদের জন্য পোনার প্রাপ্যতা

আকার ও ওজন ঃ

স্বভাবগত ভাবে মাছ ও চিংড়ি ঝাঁকে চলার কারণে এক সাথে সবার বৃদ্ধি সমান হয় না। তাই অর্থনৈতিকভাবে বেশী লাভের জন্যে বড় মাছ ও চিংড়িগুলোকে আহরণ করে ছোটগুলোকে বড় হওয়ার সুযোগ করে দেয়া উচিত। এ জন্যে যখনই চিংড়ি ৫০ গ্রামের উপরে গেলে বাজারদর বিবেচনায় আহরণ করা উচিত।

জীবভর ঃ

জীবভর হলো পুকুরে মজুদকৃত সমস্ত মাছ ও চিংড়ির মোট ওজন। জীবভর শতাংশ প্রতি ৭.৫ কেজির বেশী রাখা উচিত নয়। এতে পুকুরের পানির পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট হতে পারে, রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। তাই যখনই জীবভর প্রতি শতাংশে ৭.৫ কিলোর বেশী হবে তখনই বড় মাছ ও চিংড়িগুলো আহরণ করা উচিত।

মাছ ও চিংড়ি চাষের ঋতু ভিত্তিক ঝুঁকি ঃ

মাছ ও চিংড়ি চাষে ঋতুভিত্তিক বেশ কিছু ঝুঁকি থাকে। এ সব ঝুঁকি মোকাবিলায় সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। এমন কি অনেক সময় সমস্ত চাষ ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে পারে। ঝুঁকিগুলো হচ্ছে-

১. বর্ষাকালীন ঝুঁকি ঃ

বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি বা বন্যায় সমস্ত মাছ ও চিংড়ি ভেসে যেতে পারে। তাই এ সময়ের আগেই বড় অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা উচিত।

২. শুষ্ক মৌসুমের ঝুঁকি ঃ

শুষ্ক মৌসুমে পানির স্ড়র নীচে নেমে যেতে পারে বা পানির গভীরতা কমে যেতে পারে। এ অবস্থায় পানি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। ফলে সমস্ড় মাছ ও চিংড়ি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই বাজারজাতযোগ্য মাছ ও চিংড়ি ধরে ফেলা উচিত।

৩. শীতকালীন ঝুঁকি ঃ

গত কয়েক বৎসর যাবত আমাদের দেশে ক্ষতরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। এ রোগ সাধারণতঃ নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসেই বেশী দেখা দেয়। এ সময়ে পুকুরে জীবভর বেশী থাকলে এ রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সে কারণে এ সময়ের আগেই বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে পুকুরের জীবভর কমিয়ে দেয়া উচিত।

চুরি ঃ

এটা একটা সাধারণ সামাজিক ঝুঁকি। পুকুরে মাছ ও চিংড়ি বড় হলে এ ঝুঁকি বেড়ে যায়। সে কারণে বড় মাছ ও চিংড়ি আহরণ

করলে চুরির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

বাজার দর ঃ

যেহেতু মাছ ও চিংড়ি চাষের সাথে আর্থিক লাভের একটি সম্পর্ক রয়েছে, তাই আহরণের সাথে মাছ ও চিংড়ির দামের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজার দর বিভিন্ন এলাকায় ও ঋতুতে কম বেশী হয়ে থাকে। লাভজনক দামের প্রতি খেয়াল রেখেই মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা উচিত।

এ ছাড়াও চিংড়ি আহরণে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা হয়। যেমন-

নমুনায়নের সময় যদি দেখা যায় হাটার বড় পায়ের চিমটার উপরের অংশ নীল বা কালো রংয়ের হয়ে গেছে তাহলে চিংড়ির আর দৈহিক বৃদ্ধি হবে না। ফলে পুকুর থেকে এ সব চিংড়ি তুলে ফেলাই লাভজনক। সাধারণত পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে আকারে বড় হয়ে থাকে। সে কারণে অধিকাংশ চাষীরাই তাদের পুকুরে পুরুষ চিংড়ির মজুদ রাখতে আগ্রহ দেখায়। এ ক্ষেত্রে নমুনায়ন বা আংশিক আহরণের সময় পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ি তুলে ফেলে পুরুষ চিংড়ি পুনঃমজুদ করা যায়। উল্লেখ্য যে চিংড়ির ওজন ৩০-৪০ গ্রাম হলে স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায়।

চিংড়ি আহরণের আগে চাষীর প্রস্তুতি ও আহরণকালীন সাবধানতা ঃ

- উপযুক্ত পরিবহণ যানসহ চিংড়ির ক্রেতা পূর্বেই নির্ধারিত রাখা
- ধৃত চিংড়ি ভালভাবে ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির সরবরাহ রাখা
- অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় এবং তারপর দু'দিন গলদা চিংড়ি না ধরা, এ সময় বেশীর ভাগ গলদা চিংড়ির খোলস নরম থাকে
- ধরার সময় চিংড়ি যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয় সে জন্য যথা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা
- চিংড়ি ধরেই তা ছায়ায় রাখার জন্য খামারে উপযুক্ত ছাউনির ব্যবস্থা করা
- মাটি, ঘাস, বাঁশের ঝুড়ি ও চাটাই, হোগলার পাটি, পাটের চট ইত্যাদির উপর চিংড়ি না রেখে মসৃণ পাকা প- াষ্টিক সিটের উপর রাখা

- বরফ পানিতে চিংড়ি রেখে ঠান্ডা করে ১ঃ১ অথবা ১ঃ২ আনুপাতিক হারে চিংড়ি ও স্বাস্থ্যসম্মত করফ দিয়ে পরিবহন করতে হবে।
- চিংড়ি ধরার কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। ১ সপ্তাহ আগে থেকে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে।
- এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের অন্ততঃ ২১ দিন পর চিংড়ি বা মাছ আহরণ করতে হবে।

মাছ আহরণ পদ্ধতি ঃ

পুকুর বা জলাশয়ের আয়তন এবং মাছ আহরণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করেই আহরণের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। মাছ আহরণ পদ্ধতি সাধারণতঃ তিন ধরনের-

১. বেড় জাল পদ্ধতি

২. ঝাঁকি জাল পদ্ধতি

৩. ট্র্যাপ (ঘূণি, দুয়াড় ইত্যাদি) পদ্ধতি

৪. পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি

১. বেড় জাল পদ্ধতি ঃ

যদি পুকুর আয়তনে বড় হয় এবং বেশী পরিমানে মাছ ও চিংড়ি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে বেড় জালব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেড় জালের ফাঁসেরআকার ১ /২ ইঞ্চি হওয়া উচিত। জাল উচ্চতায় পানির গভীরতার দ্বিগুণ এবং লম্বায় পুকুরের দৈর্ঘ্যের কমপক্ষে দেড়গুণ হওয়া উচিত। একই পুকুরে একই দিনে দু'বারের বেশী জাল টানা উচিত নয়। এতে মাছ ও চিংড়ির উপর চাপ পড়ে এবং ছোট মাছ ও চিংড়িগুলো আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যেতে পারে। জাল টানার পর যথা শীঘ্র বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে ছোটগুলো ছেড়ে দেয়া উচিত।

২. ঝাঁকি জাল পদ্ধতি ঃ

যদি স্বল্প পরিমাণ মাছ ও চিংড়ি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে ঝাঁকি জালই উত্তম। মাছ ও চিংড়ি ধরার ২০-২৫ মিনিট আগে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের নির্দিষ্ট স্থানে ৩-৫ টি খাদ্য বল দিলে এদের ধরা সহজ হবে।

৩. ট্র্যাপ পদ্ধতি ঃ

ঘুণি, দুয়াড় ধোছনা, আটন ইত্যাদি পেতে রেখে চিংড়ি আহরণ ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

৪. পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি ঃ

চিংড়ির আহরণের জন্য এ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর। এ ক্ষেত্রে পুকুরের সমস্ড় পানি নিষ্কাশন করে আহরণ করা হয়।

আহরণের সময় ঃ

ঠান্ডা এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় মাছ ও চিংড়ি ধরা উচিত। বিশেষ করে ভোর বেলা মাছ ও চিংড়ি ধরার উত্তম সময়। এ ছাড়াও স্থানীয় বাজারের সময়ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

গলদা চিংড়ির গ্রেডিং

মাথা সহ		মাথা ছাড়া	
গ্রেড	প্রতি কেজিতে সংখ্যা	গ্রেড	প্রতি ৫০০ গ্রামে সংখ্যা
৫	৫ পর্যন্ত	৫	৫ পর্যন্ত
১০	৬ - ১০	৮	৬ - ৮
২০	১১ - ২০	১২	৯ - ১২
৩০	২১ - ৩০	২০	১৩ - ২০
৫০	৩১ - ৫০	৩০	২১ -৩০

মাছ ও গলদা চিংড়ির বাজারজাতকরণ ঃ

মাছ ও চিংড়ি বাজারজাতকরণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো উৎপাদিত/আহরণকৃত মাছ ও চিংড়ির গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখা। এ লক্ষ্যে যা যা করণীয় অর্থাৎ আহরণের সময় কাল থেকে শুরু করে বরফ দেয়া, স্বাস্থ্যকর পাত্রে সংরক্ষণ ও পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখা জরুরী। বিশেষত: চিংড়ি বাজারজাতকরণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। চিংড়ি কোন ফড়িয়ার নিকট বিক্রি করা যাবে না। লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিপো, আড়ত বা ফ্যাক্টরীতে বিক্রি করতে হবে।

চিংড়ি বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ঃ

আকার ও গুণগতমান অনুযায়ী বাছাইকৃত চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য সুবিধাজনক পরিবহন পাত্রে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। আহরণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়িকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। পরিবহন বাক্সে বা পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ দিয়ে তার উপর এক স্তর চিংড়ি সাজাতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বরফ ও চিংড়ি সাজানোর পরে সবার উপরে পুরু করে এক স্তর বরফ দিয়ে প্যাকিং করতে হবে। এভাবে চিংড়ি সাজানোর সময় খেয়াল রাখা উচিৎ যেন পাত্রে ২ ফুট এর বেশি উচ্চতায় চিংড়ি সাজানা না হয়। কারণ এতে উপরের চিংড়ি ও বরফের চাপে নিচের চিংড়ির দৈহিক বা আকৃতিগত ক্ষতির আশংকা থাকে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত চিংড়ির কোন সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠে নাই। ফলে চিংড়ি চাষী ও ক্রেতাদের মধ্যে বহু মধ্যবর্তী লোক চিংড়ি বিপণনের সাথে জড়িত। এসব মধ্যস্বত্বভোগীদের চিংড়ির ন্যায় একটি মূল্যবান সম্পদ সঠিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে কোন জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক সময়ে উৎপাদিত পণ্য বিপণনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য বিপণনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে মানসম্মত বিপণন ব্যবস্থার উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার। সাথে সাথে চিংড়ি এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বরফ কল ও অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি।

আহরণের পর চিংড়ি টাট্কা রাখার জন্য করণীয় কাজ ঃ

- ধরার পর চিংড়ি রোদে না রেখে অবশ্যই ঘরের মধ্যে বা কোন চালের নীচে ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা
- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত মসৃণ পাকা জায়গা অথবা প্লাস্টিক সিটের উপর রাখা যাতে চিংড়ির গায়ে কোন ময়লা, ঘাসের টুকরা ইত্যাদি লাগতে না পারে।
- পরিষ্কার ও শীতল পানিতে চিংড়ি ভালভাবে ধুয়ে শীতল করা।
- পরিষ্কার চিংড়ি বরফ/ঠান্ডা পানির ট্যাংকে সর্বোচ্চ ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখা যাতে করে চিংড়ির শরীরের সব জায়গা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায়।

চিংড়ি পরিবহনকালীন বিবেচ্য বিষয় ঃ

- বরফের পানিতে ঠান্ডা করা আস্ত চিংড়ি কুচি বরফের মধ্যে প্লাস্টিকের বাক্সে ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাক বা ভ্যানে পরিবহন করা
- দিনের বেলায় সূর্যের আলো ও তাপের মধ্যে খোলা নৌকা, ভ্যানগাড়ী, রিকশা বা সাইকেলে চিংড়ি পরিবহন না করা
- সব সময় চিংড়ির বাক্স ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা
- পরিবহনে কত সময় লাগবে তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণতঃ চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ১:১ হয়। দিনের তাপমাত্রাও এ ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়।
- পরিবহনের সময় চিংড়িতে যেন তাপ না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা
- প্যাকিং সামগ্রী হিসাবে বাঁশের ঝুড়ি, হোগলা পাটি, চট ও কলা পাতা ব্যবহার না করা। এ ক্ষেত্রে ফুড গ্রেডেড প- াষ্টিকের বাস্কেট ব্যবহার করতে হবে।
- ধরার পর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে চিংড়ি কারখানায় পৌঁছানো
- পরিবহনের পর পরিবহন যান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ভাল ভাবে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা।

পুনঃ মজুদ

বেশী উৎপাদন পেতে হলে পুকুরের চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা চক্র সারা বছর ধরে চালু রাখতে হবে। উৎপাদন চক্র চালু রাখার জন্যে যখনই চিংড়ি আহরণ করা হবে তখন যদি মৌসুম থাকে তবে ১০-১৫% অতিরিক্ত জুভেনাইল মজুদ করা যেতে পারে।

অধিক উৎপাদন পেতে আংশিক আহরণের পর অবশ্যই পূনঃমজুদের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। চিংড়ি আহরণের পর সংরক্ষণে যতদ্রুত সম্ভব জীবাণু মুক্ত বরফ ব্যবহার করা উচিত।

১০.৯ রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

প্রত্যেক চাষীর একটি করে রেকর্ড বই থাকা একান্ড়ই দরকার। এই রেকর্ড বইয়ে চাষীর নাম, ঠিকানা, পুকুরের অবস্থা, আয়তন ও বৈশিষ্ট, চুন, সার, মজুত সংখ্যা, আকার, মজুদের তারিখ, চাষকালীন সার ও খাদ্র প্রয়োগের তারিখ ও মাত্রা, ক্রয়মূল্য ও চিংড়ি ও মাছের শারিরীক বৃদ্ধির হার, আহরণ, চিংড়ি চাষীর মজুদ ব্যয়ের বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি তথ্য নিয়মিত লিপিবদ্ধ করতে হবে। এসব তথ্য মৎস্য সম্প্রসারণকারীকে দেখালে তিনি আগামী মৌসুমে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চিংড়ির উৎপাদন, গুণগতমান এবং লাভের পরিমাণ আরও বাড়ানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন। এসব তথ্য লিপিবদ্ধ করে না রাখলে কারো পক্ষেই চিংড়ি চাষীকে ভাল উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

১০.১০ গলদা চিংড়ির সাধারন রোগ, প্রতিকার এবং প্রতিরোধ ঃ

রোগ হচ্ছে যে কোন প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় চিংড়ির মাঝেও নানা ধরনের রোগ বালাই হতে দেখা যায়। রোগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে প্রতি বছরই অনেক চাষীর পুকুরে ব্যাপক আকারে চিংড়ি মারা যায়, চাষী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং দেশ লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হয়।

রোগের কারণ ঃ

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগ-জীবাণু এবং চিংড়ির অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে জন্য চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। এখন পর্যন্ত যে সব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- ➢ পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি-(পানির তাপমাত্রা, পচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি)
- ➢ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ
- ➢ বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দুষিত পানির প্রবেশ
- ➢ অধিক মজুদ ঘনত্ব
- ➢ প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব
- ➢ ত্রুটিপূর্ণ পরিবহণ ও হ্যান্ডেলিং
- ➢ পুকুরের তলায় অতিরিক্ত পঁচা জৈব পদার্থ ও বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি
- ➢ পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবানুর সংক্রমন।

রোগের সাধারণ লক্ষণ ঃ

রোগের প্রকারভেদ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা পরজীবির আক্রমনের ধরন অনুযায়ী রোগাক্রান্ত চিংড়ির মাঝে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে রোগাক্রান্ত চিংড়ির মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ বেশী দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

রোগাক্রান্ত চিংড়ি

- ➢ ঠিকমত খাদ্য গ্রহন করে না
- ➢ ধীর গতিতে চলাচল করে
- ➢ এলোমেলোভাবে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে
- ➢ পাড়ের কাছাকাছি ভেসে খাবি খায়, কখনও পাড়ে উঠে আসে
- ➢ খোলস নরম হয়ে যায়
- ➢ ফুলকায় কালো দাগ দেখা যায়
- ➢ খোলসের উপর নীলাভ এবং সাদাটে রং/শেওলা জমে যায়
- ➢ হাঁটার অংগ এবং এন্টিনা খসে পড়ে অথবা বাঁকা হয়ে যায়

চিংড়ির সাধারণ রোগ

চিংড়ির রোগ চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। চিংড়ি রোগের ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। কারণ রোগ সনাক্তকরণ ও প্রতিটি চিংড়ির আলাদা আলাদাভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তারপরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে চিকিৎসা বা রোগের প্রতিকার করা জরুরী হয়ে পড়ে। নীচে চিংড়ির কিছু সাধারণ রোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

রোগের নাম ও কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
এন্টেনা ও সন্তরণ পদ খসে পড়া ঃ ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমন; চাষ এলাকায় মাটি দুষণ।	মজুদের ৩-৪ মাস পর এন্টেনা, সন্তরণপদ খন্ডিত অথবা ঝরে পড়তে থাকে।	সাময়িকভাবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ; সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন; পিএইচ পরীক্ষা করে ২৫০-৩০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ডলোমাইট প্রয়োগ।
খোলস শক্ত হয়ে যাওয়া ঃ পরিবেশগত; পিএইচ, লবনাক্ততা, পানির রাসায়নিক গুনাগুনের তারতম্য বা তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে খোলস পাল্টায় না, শক্ত হয়ে যায়।	খোলস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শক্ত; বয়সের তুলনায় চিংড়ির কম দৈহিক বৃদ্ধি।	পানির পরিবেশ উন্নয়ন; পরিবেশের যে কোন হঠাৎ পরিবর্তন যেমন- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা রাসায়নিক সার প্রয়োগ; সুষম খাদ্য নিয়মিত ও পরিমাণমতো প্রয়োগ করা।
ক্যারাপেস ও শরীরের উপর শেওলা ও ঝিনুক জাতীয় পরজীবের সংক্রামন পরিবেশগত যে কোন প্যারামিটারের তারতম্যের কারণে এটা হয়ে থাকে। বিশেষ করে লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এটা বেশী হতে দেখা যায়।	করাত ও ক্যারাপেস অংশে ধূসর রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর দেখা যায়।	পুকুরের পানি পরিবর্তন; পানির সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পানির গভীরতা ১.৫ মিটারের বেশী রাখা।
নরম খোলস বা স্পঞ্জের মত দেহ চাষাবাদের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই গলদা চিংড়ির মাঝে এ রোগ দেখা দেয়। পানিতে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া; এ্যামোনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া; পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব; অনেকদিন পানি পরিবর্তন না করা।	খোলস নরম হয়ে যায়। পা লম্বা ও লেজ ছোট হয়। দেহ ফাঁপা হয়ে স্পঞ্জের মত হয়।	পুকুরে প্রতিমাসে শতাংশ প্রতি মাসে ২০০ গ্রাম হারে ডলোমাইট প্রয়োগ। খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে।
খোলস পাল্টানোর পর মৃত্যু খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন এবং খনিজ দ্রব্যের অভাব।	দেহ নরম থাকে এবং রং নীলাভ হয়ে যায়; মৃত চিংড়ি রান্না করলে রং হালকা কমলা বর্ণ ধারণ করে।	খাদ্যের সংগে ৫০ মিলি গ্রাম/কেজি হারে ভিটামিন প্রি-মিক্স প্রয়োগ।
গায়ে শেওলা পড়া খোলস পরিবর্তন না করা ও চিংড়ির চলাফেরার গতি কমে যাওয়া	চিংড়ি ধরার পর সারা দেহে সবুজ অ্যালজি দেখা যায়	পানি বাড়িয়ে দিতে হবে এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে

চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

আমাদের দেশে চাষীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা ও চিকিৎসা পদ্ধতির জটিলতার কারণে চিংড়ির রোগ চিকিৎসা চাষীদের পক্ষে শুধু কষ্ট সাধ্যই নয়; অনেকটা অসম্ভবও বটে। সে কারণে মনে রাখা দরকার রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধই অধিক শ্রেয়। চাষের শুরুতেই নীচের পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করলে চিংড়ির রোগ চিকিৎসার মত বিরক্তিকর বিষয় পরিহার করা যেতে পারে

- পুকুরে পরিমিত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা
- পুকুর শুকিয়ে নিয়মিত চুন দেয়া
- কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত চারা পোনা বা জুভেনাইল মজুদ না করা
- বাইরের অবাঞ্চিত প্রাণী ও পানি পুকুরে ঢুকতে না দেয়া
- তলায় অতিরিক্ত কাদা না রাখা
- পরিমিত সার ও খাদ্য সরবরাহ করা
- পুকুরে ঘন ঘন জাল না ফেলা
- পুকুরে ঘোলাত্ব সৃষ্টির উৎস বন্ধ করা

রোগ প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধই উত্তম। মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের জন্য জীবানুমুক্ত পোনা, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার এবং পুকুরের পানির গুনাগুন পরীক্ষা করে চাষোপযোগী পর্যায় রাখতে পারলেই অধিকাংশ রোগই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

১০.১১ গলদা চিংড়ি চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

১.০০ একর পুকুরে গলদা চিংড়ি একক চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব

ব্যয়ের হিসাব ঃ

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত ও কাজের বিবরণ	ব্যয়ের টাকা
১.	পুকুর সংস্কার (পাড় মেরামত, তলার কাঁদা উত্তোলন	১৫০০০.০০
২.	আগাছা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ	৫০০০.০০
৩.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে ২০০ কেজি চুন ক্রয়	২৫০০.০০
৫.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে ইউরিয়া ১৩০ কেজি	১৫৬০.০০
৬.	পুকুর প্রস্তুতকালীন ও পরবর্তী সময়ে টিএসপি ৭০ কেজি	২০০০.০০
৭.	জুভেনাইল ক্রয় ১০০০০টি	১০০০০০.০০
৮.	সিলভারকার্প ও কাতলা মাছের পোনা(১০-১৫ সে.মি) ক্রয় ৩০০টি	১৫০০.০০
৯.	বিভিন্ন প্রকারের মোট ৩০০০ কেজি সম্পূরক খাদ্য ক্রয় বাবদ	১৫০০০০.০০
১০.	মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ	৩০০০০.০০
১১.	পুকুর বেষ্টনী নির্মাণের জন্য নেট ক্রয় বাবদ	১০০০০.০০
১২.	বিবিধ	১০০০০.০০
	সর্বমোট	৩২৭৫৬০.০০

(কথায়ঃ তিন লক্ষ সাতাই হাজার পাচঁশত ষাট টাকা মাত্র)

আয়ের হিসাব ঃ

ক্রমিক নং	আয়ের খাত ও বিবরণ	আয়ের পরিমাণ(টাকা)
১.	মাছ উৎপাদন-৩০০.০০ কেজি	৩০০০০.০০
২.	গলদা চিংড়ি উৎপাদন ৬৫০ কেজি	৬০০০০০.০০
	সর্বমোট	৬৩০০০০.০০

(কথায়ঃ ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)

মোট আয়= ৬৩০০০০.০০

মোট ব্যয়= ৩২৭৫৬০.০০

নীট লাভ = ৩০২৪৪০.০০ (কথায়ঃ তিন লক্ষ দুই হাজার চারশত চল্লিশ টাকা মাত্র)

বিভিন্ন উপকরণের স্থানীয় বাজারমূল্য এবং চিংড়ি বিক্রয়ের স্থান অনুসারে বিক্রয়মূল্যে ভিন্নতা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে লাভের পরিমান কম-বেশী হতে পারে। চাষী ক্লাস্টার গঠনের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে, একই চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে উৎপাদিত চিংড়ি একসঙ্গে অধিক চিংড়ি সরাসরি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় বিক্রি করতে পারলে অধিকমূল্য নিশ্চিত করা যায়।

অধিবেশন - ১১

গলদা চিংড়ির নার্সারী কার্যক্রম ঃ

নার্স শব্দ থেকে নার্সারি শব্দের উৎপত্তি। নার্সারি এমন একটি জায়গা যেখানে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদকে জীবদশায় লালন- পালন করা হয়। গলদা চিংড়ির রেণু /পোষ্ট লার্ভা (পিএল) কে নার্সরী পুকুরে প্রয়োজনীয় পতিপালনের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যত্ন সহকারে লালন-পালন করে মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযোগী কিশোর চিংড়ির বা জুভেনাইল উৎপন্ন করার কৌশলকে গলদা চিংড়ি নার্সারী ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

গলদা চিংড়ি চাষে নার্সারীর গুরুত্ব ঃ

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গলদা চিংড়ির নার্সারি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত লাভজনক। যথাসময়ে সঠিক আকার ও সুস্থ, সবল উন্নত মানের পোনার দুস্প্রাপ্যতা চিংড়ি চাষে ভালো ফল লাভের একটি বড় বাঁধা। গুনগতমানসম্পন্ন পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে নার্সারি স্থাপন করা একান্ত অপরিহার্য । বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী হ্যাচারিতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চিংড়ির পিএল উৎপাদিত হয়। কিন্তু যে পরিমাণ রেণু / পিএল উৎপাদন করা হয় তার একটি বৃহওর অংশ বাঁচানো সম্ভব হয় না। কারন-

- রেণু পোনা / পিএল-এর লালন পালন সম্পর্কে চাষিদের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব
- রেণু পোনা / পিএল ঘেরে/চাষ এলাকায় সরাসরি মজুদ করা
- রেণু / পিএল এর সহজেই রাক্ষুসে মাছ ও জলজ প্রাণীর শিকারে পরিণত হওয়া
- নার্সারি পুকুরে চারা পোনা / জুভেনাইল তৈরি করে মজুদ পুকুরে ছাড়লে রেণু পোনা / পিএল এর এই নাজুক পর্যায়কে সযত্নে পরিহার করা সম্ভব হয়।

গলদা নার্সারি ব্যবস্থাপনার বাড়তি সুবিধা সমুহ ঃ

- সময়মত সঠিক আকারের পোনা / জুভেনাইল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
- চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের প্রয়োজনীয় সুস্থ সবল মানসম্নত পোনা / জুভেনাইল প্রাপ্তি
- চাষের পুকুরে মজুদ ঘনত্বের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়
- আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদের সুযোগ সৃষ্টি
- মজুদ পুকুর থেকে অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা

গলদা নার্সারি ব্যবস্থাপনার সময়কাল ঃ

বছরের কোন সময়ে নার্সারি কার্যক্রম শুরু করতে হবে তা মূলতঃ নির্ভর করে রেণু / পিএল প্রাপ্তি এবং পুকুরে পানির পর্যাপ্ত তার উপর। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক উৎস হতে মার্চ- সেপ্টেম্বর এবং হ্যাচারি থেকে মার্চ-আগস্ট মাসে গলদা চিংড়ির রেণু / পি এল পাওয়া যায় তবে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত নার্সারি কার্যক্রমের উপযুক্ত সময়।

গলদা নার্সরীর প্রকারভেদ ঃ

নার্সারী সাধারণতঃ ৩ প্রকার।

- মেটে নার্সারী (মাটির তৈরী)
- পাকা নার্সারী এবং
- আধা পাকা নার্সারী (পাকা পাড়, তলা মাটির)

গলদা নার্সারি পুকুরের বৈশিষ্ট্য ঃ

- পুকুরের মাটি দো-আঁশ/এটেল-দো-আঁশ/বেলে দো-আঁশ
- পুকুরের আয়তন ২০-৩০ শতক হলে ভাল হয়
- পানির গভীরতা হতে হবে ৩.০০-৪.০০ ফুট
- তলায় পচা কাদা না থাকলেই ভাল হয়
- পুকুরের ঢাল ১ঃ২ অথবা ১ঃ১.৫ হওয়া উচিত
- পাড় উঁচু হতে হবে
- পুকুরের তলা সমান এবং একদিকে ঢালু হলে ভাল যাতে প্রয়োজনে সেচের মাধ্যমে সকল পোনা ধরা যায়
- পুকুরে সারাদিন আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- প্রয়োজনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবারের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- অতিরিক্ত তাপ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে ছায়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে

গলদা নার্সারি পুকুরের মাটির গুণাগুণ ঃ

সাধারণতঃ চিংড়ির নার্সারি কার্যক্রমের জন্য দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটিই বেশী উপযোগী। তবে এসিড সালফেট এবং কম পিএইচ মান সম্পন্ন মাটিতে চিংড়ির নার্সারি কার্যক্রম ভাল হবে না।

নার্সারি পুকুর সংস্কার ঃ

গলদা নার্সারি ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতকালীন সময়ে পুকুর সংস্কার জরুরী। পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে-

- পুকুর পাড় ঝোপঝাড় মুক্ত রাখা
- পাড় মেরামত
- পাড়ের ঢাল মেরামত
- পুকুরের তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ
- পুকুরের তলদেশ সমান রাখা
- পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডালপালা ছাটাইকরণ
- পুকুর তলদেশ ভালোভাবে শুকানো

পাড় মেরামত ঃ

- নার্সারিপুকুরের পাড় এমন উঁচু করতে হবে যাতে স্বাভাবিক বর্ষায় ডুবে না যায় এবং বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পুকুরে যেতে না পারে।
- পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাইরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।
- পাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তা ভরে দিতে হবে যাতে বাইরের পানি চুইয়ে পাড় ভেঙ্গে ফেলতে না পারে।
- প্রয়োজনে পানি চুঁয়ানো নিয়ন্ত্রণের জন্যে পলিথিন সীট ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাড়ের ঢাল মেরামত ঃ

- পুকুর পাড়ের ঢাল ভাঙ্গা থাকলে বা ঢালের গায়ে গর্ত থাকলে তা মেরামত করতে হবে। তাহলে পাড় সহজে ভাঙ্গবে না।
- পাড়ের ঢাল ২:১ অনুপাতে রাখা দরকার। এতে পাড় ভেঙ্গে পড়বে না, জাল টানা সহজ হবে এবং সঠিকভাবে মাছ আহরণ করা যাবে। এছাড়া সূর্যের আলো কার্যকরভাবে পুকুরের পানিতে পড়ায় প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে।

তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ ঃ

পুকুরের তলায় বেশি কাদা থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে -

- বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে
- পোনা / পিএল এর চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়
- সহজে হররা টানা যায় না
- অক্সিজেনের অভাব হতে পারে।

তলদেশ সমানকরণ ঃ

- তলদেশে গর্ত বা উঁচু-নিচু থাকলে সমান করে দিতে হবে এবং তলা একদিকে ঢালু রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনে পানি সেচে সকল পোনা ধরা যায়। এতে হররা টানাও সহজ হয়।

বেষ্টনী স্থাপন ঃ

গলদা নার্সারি পুকুরের চারিদিকে বাজারে প্রাপ্ত লাইলন নেট দ্বারা এমনভাবে বেষ্ঠনী নির্মান করতে হবে যাহাতে বাইরে থেকে কোন প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে। সঠিকভাবে বেষ্ঠনী নির্মান করা হলে পোনার বেঁচে থাকার হার অনেক বৃদ্দি পাবে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ ঃ

গলদা নার্সারিপুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ লাভজনকভাবে চিংড়ির জুভেনাইল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। পুকুরে এসব মাছের উপস্থিতি নানাভাবে চিংড়ির পিএল / জুভেনাইল উৎপাদনকে ব্যাহত করে, ফলে ভাল ব্যবস্থাপনা সত্বেও সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই পিএল মজুদের পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই সমস্ত রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা উচিত। এক্ষেত্রে পূর্বে আলোচিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

চুন প্রয়োগ ঃ

চুনের প্রয়োগের মাত্রা ঃ

মাটির পিএইচ ও চুনের ধরনের ওপর নির্ভর করেই কেবল চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। যখন শুধুমাত্র পিএইচ কে বিবেচনা করে চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে ক্ষেত্রে পোড়া চুন, পাথুরে চুনের চেয়ে দ্বিগুণ ও কলি চুল থেকে দেড়গুণ শক্তিশালী ধরে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নিম্নের সারণীতে শতাংশ প্রতি চুনের মাত্রার একটি নির্দেশনা দেয়া হলো-

পিএইচ	পোড়া চুন	কলি চুন	পাথুরে চুন	ডলোমাইট
৩-৫	৬ কেজি	৯ কেজি	১২ কেজি	৯-১০ কেজি
৫-৬ (এটেল মাটি)	৪ কেজি	৬ কেজি	৮ কেজি	৮-৯ কেজি
৬-৭ (দো-আঁশ মাটি)	১-২ কেজি	৩ কেজি	৪ কেজি	৩-৪ কেজি

মাটির ধরন অনুযায়ী পোড়া চুনের প্রতি শতাংশে প্রয়োগ মাত্রা উলে- খ করা হলো-

মাটির ধরন	নতুন পুকুর	পুরাতন পুকুর
দো-আঁশ	১ কেজি	২ কেজি
এটেল	৪ কেজি	৬ কেজি

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

প্রথমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চুন পুকুর পাড়ে ব্যারেলে / মাটির গর্তে/ মাটিতে পোতা হাড়িতে/ পাকা চৌবাচ্চায় ভেজাতে হবে। ঠান্ডা হওয়ার পর গুলিয়ে নেটের উপরে ফেলে ছেঁকে পুকুরের পাড়সহ সমস্ত পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

ব্লিচিং পাউডার ঃ

নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির সময় চুনের পরিবর্তে সাম্প্রতিককালে ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার প্রচলন হয়েছে।

প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির জন্য ৭২০ গ্রাম। পানিতে গুলিয়ে অন্ধকার রাতে ব্যবহার করতে হবে।

প্রস্তুত কালীন সার প্রয়োগ ঃ

সার প্রয়োগ মাত্রাঃ

১. শতাংশ প্রতি

চিটাগুড়	চাউলের কুড়া	ইষ্ট
২০০ গ্রাম	**১০ গ্রাম**	**০৫ গ্রাম**

মিশ্রন প্রয়োগের প্রতিদিন ৫-৭ বার পানি ঘোলা/ওলট- পালট করতে হবে, যাতে মিশ্রনের তলানি নিচ থেকে উপরে উঠে আসে

অথবা

২. শতাংশ প্রতি

ইউরিয়া	টিএসপি সার
১০০ গ্রাম	**১০০ গ্রাম**

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

১টি পাত্রে পরিমাণমত চাউলের কুড়া, চিটাগুড়া ও ইষ্ট নিয়ে পানি দিয়ে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন ছেঁকে ফেলে তরল পানি সমস্ত ঘেরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরূপে পর পর ৩ দিন দিতে হবে। শেষ দিনে সকল দ্রব্যই ছড়িয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগের সময় ঃ

চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর এবং পিএল মজুদের ৮-১০ দিন আগে নার্সারি পুকুরে প্রস্তুতকালীন সময়ে পূর্বোক্ত যে কোন একটি পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হয়। দিনের যে কোন সময় সার প্রয়োগ করা যায়। তবে, সাধারণতঃ সূর্যালোক পড়ার পর সার প্রয়োগ করাই উত্তম। এ সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণঃ

নার্সারী পুকুরে পি এল মজুদের পূর্বে তাদের উপযোগী খাদ্য তৈরি করে নিতে হবে। তাই মজুদের পূর্বে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা গলদা নার্সারী ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অংশ। পি এল মজুদের আগেই নার্সারী পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে হয়। পুকুরের পানির রং বাদামি সবুজ বা হালকা বাদামি হলে বুঝতে হবে পুকুরের পানি পি এল ছাড়ার উপযোগী; কারণ এ সমস্ত রং এর পানিতে চিংড়ির পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য জুপ্লাংকটন প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকবে।

পানির উপযুক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার জন্য পুকুরে একটি হাপা টাঙ্গিয়ে তার মধ্যে ১০০টি গলদা চিংড়ির পিএল ছেড়ে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে অধিকাংশ পিএল (৭০-৮০% বেঁচে থাকে) মারা না যায় তবে বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা নেই। এ অবস্থায় পুকুরে পিএল মজুদ করা যাবে। যদি এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ পিএল মারা যায় তবে বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা আছে।

পি এল এর আশ্রয়স্থল স্থাপন

গলদা চিংড়ির পিএল-এর শারীরিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ভিন্নতর। চিংড়ির পিএল খোলস বদলানোর মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। খোলস বদলের সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যেগুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দুর্বলগুলোকে খেয়ে ফেলতে পারে। এজন্য চিংড়ি নার্সারী ব্যবস্থাপনায় আশ্রয়স্থল স্থাপনের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন যাতে অন্য প্রাণী বা চিংড়ি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা না থাকে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের গুরুত্ব ঃ

- খোলস পাল্টানোর সময় সবল চিংড়ি যাতে দূর্বল চিংড়িকে খেতে না পারে সে জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে।
- উচ্চ তাপমাত্রা থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে
- প্রাকৃতিক খাদ্য (পেরিফাইটন) জন্মাতে সাহায্য করে

- তলার উপর পিএল'র বসার ব্যবস্থা করে

আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত উপকরণ ঃ

- শুকনা তাল বা নারিকেলের পাতা
- বাঁশের কঞ্চি / বাঁশের চোঙ্গা
- প্লাস্টিকের ফাঁপা পাইপ
- খেজুরের কাঁচা পাতা

আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশল ঃ

তাল বা নারিকেলের পাতা এমনভাবে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে পাতার অংশ মাটি থেকে একটু উপরে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাল বা নারিকেলের পাতা কোনাকোনি (৪৫°) পুতে দিলে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেশি জায়গা পাওয়া যাবে এবং পাতাগুলো মাটির উপর থাকলে সহজে পচবে না। বাঁশের কঞ্চি আটি বেঁধে অথবা প- াষ্টিকের পাইপ পৃথক পৃথকভাবে পুকুরের তলায় মাটির উপর রেখে দিতে হবে। খেজুরের পাতা আটি বেঁধে দেয়া যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের পরিমাণ ঃ

তাল বা নারিকেল বা খেজুর পাতা প্রতি শতাংশে ১-২ টি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। অন্যান্য উপকরণগুলো আনুপাতিক হারে ব্যবহার করতে হবে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সময় ঃ

পিএল মজুদের ১-২ দিন আগে

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সর্তকতা ঃ

- কোন অবস্থাতেই কাঁচা পাতাসহ ডাল বা কঞ্চি পুকুরে দেয়া যাবে না
- কয়েক ৭ দিন পর পর ডাল বা কঞ্চি তুলে শুকিয়ে পুনরায় পুকুরে দিতে হবে।

খোলস বদলের সময় চিংড়ি দূর্বল থাকে। তখন এদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। কারণ সব চিংড়ি একই সময়ে খোলস বদলায় না। এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যে গুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দূর্বলগুলোকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। এ ছাড়া ও তাল বা নারিকেলের শুকনা পাতা, বাঁশের কঞ্চি, ভাঙ্গা প্লাষ্টিকের পাইপ, ভাঙ্গা কলসের টুকরা ব্যবহার করে চিংড়ির আশ্রয়স্থল তৈরী করে দেয়া যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের গুরুত্ব ঃ

- খোলস পরিবর্তনের সময় নরম চিংড়িকে তার স্বজাতির বা অন্যান্য মাছের হাত থেকে রক্ষা করে;
- চুরির হাত হতে চিংড়িকে রক্ষা করে;
- উচ্চ তাপমাত্রা থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে; এবং
- পেরিফাইটন জন্মাতে সাহায্য করে।

আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশল ঃ শুকনো তাল বা নারিকেলের পাতা ঘেরের তলায় সমান্তরালভাবে অথবা কাত করে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে পাতার অংশ মাটি থেকে একটু উপরে থাকে। বাঁশের কঞ্চি অনেকগুলো একত্রে আটি বেধেঁ অথবা প্ল্যাষ্টিকের পাইপের খন্ড বা মাটির তৈরী ছোট কলস পুকুরের তলায় মাটির উপর রেখে দিতে হবে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের পরিমাণ ঃ শুকনো তাল বা নারিকেলের পাতা প্রতি ২ শতাংশে ১-২ টি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। অন্যান্য বস্তুগুলো আনুপাতিক হারে ব্যবহার করতে হবে। তবে নার্সারীতে মজুদ ঘনত্ব (>২০০০/শতাংশ)বাড়াতে হলে আশ্রয়স্থল অন্তত মোট আয়তনের ১০% জায়গায় হওয়া উচিত।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সময় ঃ পিএল বা জুভেনাইল মজুদের ১-২ দিন আগে।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের সতর্কতা

- কোন অবস্থাতেই কাঁচা পাতাসহ ডাল বা কঞ্চি পুকুরে দেয়া যাবে না।
- কয়েক মাস পর পর ডাল বা কঞ্চি তুলে শুকিয়ে পুনরায় ঘের/পুকুরে দিতে হবে।

অধিবেশন - ১২

বায়োফ্লক প্রযুক্তি

১২.১ বায়োফ্লক মৎস্য চাষে সম্ভাবনার নবদিগন্ত ঃ

ক্রমবর্ধমান মাছের চাহিদা মেটাতে মৎস্যচাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে দিন দিন কৃষিজ জমি ও পানির ওপর চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিজ জমি সুরক্ষা ও ভূ-গভৃস্থ পানির ব্যবহার কমাতে সরকারের নীতি এখন বেশ রক্ষণশীল। এমতাবস্থায় দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর মাছের চাহিদা মেটাতে মৎস্যচাষে বিদ্যমান উন্নত-সনাতন বা আধা-নিবিড় প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে আরও নিবিড় চাষের দিকে যাওয়ার বিকল্প নেই। প্রচলিত নিবিড় চাষে নিয়মিত খামারের পানি পরিবর্তন করায় প্রচুর বর্জ্য পরিবেশে চলে আসে। অধিকন্তু, নিবিড় চাষে চাষিরা নির্বিচারে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। উচ্চ ঘনত্বে নিবিড় চাষে প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মৎস্যখাদ্যের অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি মৎস্যচাষের খরচ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার, ভাইরাস ও অন্যান্য জীবাণুঘটিত রোগ মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় একটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই মৎস্যচাষ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মৎস্যচাষের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণ সম্ভব। বাংলাদেশ একটি জনবহুল রাষ্ট্র বিধায় ভূমি ও পানির সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বায়োফ্লক প্রযুক্তি মৎস্যচাষে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

১২.২ বায়োফ্লক কী? (What is Biofloc) ?

বায়োফ্লক হলো প্রোটিনসমৃদ্ধ জৈব পদার্থ ও অণুজীব যেমন-ব্যাকটেরিয়া, ডায়াটম, প্রোটোজোয়া, এ্যালজি, অব্যবহৃত খাদ্য, মাছের মল এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী ও মৃত প্রাণী) এর দলা (Aggregation) (চিত্র ১)। এটি মূলত প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, হিউমিক পদার্থ, নিউক্লিক এসিড ও লিপিড এর সমন্বয়ে গঠিত। শুল্ক বায়োফ্লকে প্রায় ৫০% প্রোটিন, ৩৬% শর্করা, ১.১৫% চর্বি, ১৩.৪% অ্যাশ, ১২.৬% ক্রুড ফাইবার, ১.২৮% ক্যালসিয়াম, ১.৩% ফসফরাস, ১.২৭% সোডিয়াম, ০.৭৫% পটাশিয়াম ও ০.৪১% ম্যাগনেশিয়াম থাকে (Kuhn et. al., 2009)। বায়োফ্লককে ফিশমিলের বিকল্প হিসেবে মৎস্য খাদ্যের উপাদান হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

বায়োফ্লক প্রযুক্তির মূলনীতি (Principle of Biofloc Technology): নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পুকুরে প্রচুর খাদ্য প্রয়োগ করা হয়।

এসব খাদ্য উচ্চমাত্রার নাইট্রোজেন ও কার্বনসমৃদ্ধ। প্রয়োগকৃত খাদ্যের একটি বড় অংশ মাছ খায় না। খাদ্যে বিদ্যমান কার্বন ও নাইট্রোজেন এর যথাক্রমে মাত্র ১৫ ও ২৫ ভাগ মাছের শরীরে কাজে লাগে (এসিমিলেট হয়)। বাকী অংশ অব্যবহৃত খাদ্য ও মাছের মলের সাথে পানিতে থেকে যায়, যা পচে মাছের জন্য ক্ষতিকর অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি করে। পানিতে বিদ্যমান হেটারোট্রিপিক ব্যাকটেরিয়া পানির জৈব ও অজৈব নাইট্রোজেনকে (অ্যামোনিয়া অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য) গ্রহণ করে নিজেদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে। এজন্য তাদের নাইট্রোজেনের পাশাপাশি কার্বনের প্রয়োজন হয়। পানিতে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত পনের এর বেশি বজায় থাকলে হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এই অনুপাত বজায় রাখার জন্য পানিতে বাহির থেকে কার্পোহাইড্রেট (যেমন-স্টার্চ, ময়দা, মোলাসেস, কাসাভা প্রভৃতি) সরবরাহ করা হয়। প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য ও উচ্চ ঘনত্বে মাছ থাকায় পুকুরে ব্যাপক মাত্রায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এজন্য পর্যাপ্ত অ্যরেটর স্থাপন অত্যাবশ্যক। এই প্রযুক্তিতে কোন পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। কারণ, এই প্রযুক্তিতে হেটারোট্রিপিক ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য গ্রহণ করে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তর করে। প্রোটিন হলো খাবারের সবচেয়ে দামী উপাদান। স্বাভাবিকভাবে খাবারের মাত্র ২৫% প্রোটিন মাছের দেহে কাজে লাগে। বাকী অংশ পানিতে অব্যবহৃত থেকে যায়। বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে এই অব্যবহৃত প্রোটিন মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তর হওয়ায় প্রোটিন রিকভারি দ্বিগুণ হয়ে যায়। বায়োফিল্টার পদ্ধতিতে নাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকর অ্যামোনিয়াকে নিস্পাপ নাইট্রেটে রূপান্তর করে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বায়োফ্লক পদ্ধতিতে হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া, নাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়ার দশগুণ দ্রুতগতিতে অ্যামোনিয়া হ্রাস করে। ফলে এই পদ্ধতিতে পুকুরে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রিত থাকে ও উচ্চমূল্যের মৎস্য খাদ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ধরণ: সূর্যালোকের উপস্থিতি বিবেচনায় বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ দুই ধরনের।

(ক) আউটডোর: এ প্রযুক্তিতে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে পুকুর বা ট্যাংকে মাছচাষ করা হয়।এই পদ্ধতিকে সবুজ পানির বায়োফ্লক (greenwater biofloc) প্রযুক্তি বলা হয়। এখানে প্ল্যাংকটন ও ব্যাকটেরিয়া যৌথভাবে পানির মান মান নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা রাখে।

(খ) ইনডোর: এ প্রযুক্তিতে সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে ঘরের ভেতর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ট্যাংকে মাছচাষ করা হয়। এখানে হেটারোট্রটিক ব্যাকটেরিয়া পানির মান নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা রাখে। একে বাদামী পানির বায়োফ্লক (Brownwater biofloc) প্রযুক্তি বলা হয়।

১২.৩ ইতিহাস (History of Biofloc Technology)

নব্বই এর দশকের গোড়ার দিকে ইসরাইলে প্রথম বায়োফ্লক প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে মধ্য আমেরিকার দেশ বেলিজের 'বেলিজ অ্যাকোয়াকালচার ফার্মে' প্রথম বাণিজ্যিকভাবে এ পদ্ধীততে সফলভাবে চিংড়ি চাষ করা হয়। বর্তমানে থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে বায়োফ্লক পদ্ধতি চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি (Suitable Species for Biofloc Technology)

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক প্রজাতি নির্বাচন। যেসব মাছ মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে ও উচ্চমাত্রায় কঠিন পদার্থ (Suspended solid) সহ্য করতে পারে সেসব প্রজাতি বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযোগী। চিংড়ি ও তেলাপিয়া মাছ এই পদ্ধতিতে চাষের জন্য উপযুক্ত। চিংড়ি ও তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে বায়োফ্লক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০-৩০% খাদ্য সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। কার্পিও ও রুই মাছের ক্ষেত্রেও ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। আমাদের দেশের উচ্চ মূল্য ও চাহিদাসম্পন্ন মাছ যেমন-শিং, পাবদা, গুলশাসহ অন্যান্য মাছ বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযুক্ত কিনা তা গবেষনার মাধ্যমে জানতে হবে।

১২.৪ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছচাষের সুবিধা (Advantages of Biofloc Technology)

১. অনেক বেশি ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়। ফলে অল্প জায়গায় অনেক বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়।

২. এফসিআর কম, বিধায় খাদ্য খরচ কম হয়। খাদ্যের ক্রুড প্রোটিনের ৩৭% মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন পুকুরে ৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ দৈনিক ১০০ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করলে সেখানে দৈনিক **১১** কেজি মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন পাওয়া যায়।

৩. যেহেতু বিভিন্ন ধরণের উপকারী অণুজীব ব্যাপক মাত্রায় মাছের পুকুরে বিদ্যমান থাকে সেহেতু ক্ষতিকর রোগজীবাণু মাছকে আক্রমণ করতে পারে না।

৪. পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না বা খুবই স্বল্প পরিমাণ পানি পরিবর্তন করে চাষ করা যায়। ফলে দূষণের মাত্রা একেবারেই কম।

৫. বায়োফ্লকে পানি পরিবর্তন না করে অ্যারেশান দেয়া হয় ফলে বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়।

৬. ভূমি ও পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৭. সামুদ্রিক মাছকে সমুদ্র থেকে দূরবর্তী স্থানে যেখানে ভূমির মূল্য কম বা অন্যান্য সুবিধা বিদ্যমান সেরকম স্থানে চাষ করা যায়।

৮. বায়োফ্লক ব্যবহার করে বাজারের নিকটবর্তী স্বল্প স্থানে খামার স্থাপনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা বছর মাছ / চিংড়ি সরবরাহ করা যায়।

৯. মাছচাষের বিভিন্ন ধাপে যেমন-নার্সারি, লালন ও পালন পর্যায়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

১০. অধিক জৈব নিরাপত্তা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ এ যাবত কোনো বায়োফ্লক প্রযুক্তির চিংড়ি খামারে হোয়াইট স্পট সিনড্রম দেখা যায়নি।

১১. অধিক পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় টেকসই পদ্ধতি।

১২.৫ বায়োফ্লক প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Biofloc Technology) ঃ

১. বিদ্যুৎ খরচ বেশি। প্যাডেল হুইল লাগে ২৮ হর্সপাওয়ার/ হেক্টর।

২. নির-বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হয়। এজন্য বিকল্প একাধিক ব্যাকআপ জেনারেটর রাখতে হয়। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ এর বাণিজ্যিক হার কৃষির চেয়ে বেশি হওয়ায় খরচ তুলনামূলক বেশি হয়।

৩. মাটির পুকুরের পাড়সহ তলা মোটা পলিথিন (এইচডিপিই) দিয়ে ঢেকে দিতে হয় ফলে উৎপাদন খরচ বেশি হয়।

৪. দক্ষ প্রশিক্ষিত জনবলের প্রয়োজন হয়।

১২.৬ বায়োফ্লক অ্যাকোয়াকালচার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management of biofloc aquaculture)

বেশির ভাগ বাণিজ্যিক বায়োফ্লক চিংড়ি পুকুরের আয়তন ০.১ হতে ২.০ হেক্টর হয়ে থাকে, তেলাপিয়া পুকুরের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট ০.০১ হতে ০.২ হেক্টর হয়ে থাকে। কনক্রিটের তৈরি ট্যাংকেও এই পদ্ধতিতে চাষ করা যেতে পারে। মাটির পুকুরের ক্ষেত্রে তলা ও পাড় মোটা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এক্ষেত্রে এইচডিপিই (হাই ডেনসিটি পলিইথিলিন) বেশ ভাল ও টেকসই। পুকুরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের জন্য প্রতি হেক্টরে ২৮-৩২ হর্সপাওয়ার অ্যারেটর প্রয়োজন হবে। অ্যারেটরগুলো এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সমস্ত পুকুরের পানি সমভাবে মিশ্রিত হয় ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়। বায়োফ্লকগুলো সর্বদা ভাসমান অবস্থায় থাকতে হবে। কোনোভাবে যেন পুকুরের তলায় জমা না হয়। একজন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে অ্যারেটরগুলো চালু রাখতে হবে। প্রাথমিকভাবে পানিতে মাছের খাদ্য ও পরিমাণমত কার্বোহাইড্রেট দিয়ে অ্যারেটর চালু করতে হবে। অতঃপর বায়োফ্লকের উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বায়োফ্লক এর পমিাণ ১৫-২০ মিলি/ লিটার হলে মাছের পোনা অবমুক্ত হবে। চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১৩০-১৫০ টি পিএল অবমুক্ত করা যাবে। নিয়মিত ৩০% প্রোটিনযুক্ত খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি কার্বন ও নাইটোজেনের অনুপাত কাঙ্খিত মাত্রায় রাখার জন্য বাইরে হতে জৈব কার্বন সরবরাহ করতে হবে। বহায়োফ্লক এর পুকুরে অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, পিএইচ, বায়োফ্লক এর পরিমাণ ইত্যাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

উৎপাদন (Production) ঃ

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে তলায় পলিথিন বিছানো পুকুরে মাছচাষ করে প্রতি বর্গমিটারে প্রতি চাষে ১-২ কেজি (৪-৮ মে. টন/ একর) চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া গেছে। সিমেন্টের ট্যাংকে চাষ করে প্রতি বর্গমিটারে ১০ কেজি পর্যন্ত চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রতি বর্গমিটারে ২০-৩০ কেজি (একরে ৮০-১২০ টন) পওয়া গেছে।

১২.৭ কাঙ্খিত কার্বন -নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা (Maintaining Desired Carbon-Nitrogen Ratio) ঃ

বায়োফ্লক প্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাঙ্খিত মাত্রায় কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা। একটি ৩০-৩৫% প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত থাকে ৯-১০:১। এই অনুপাত যদি ১৫:১ রাখা যায় তবে হেটারেট্রপিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় ও অ্যামোনিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। খাদ্য প্রোটিনের পরিমাণ কমানোর মাধ্যমে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বাড়ানো যায়। তাছাড়া পানিতে সরাসির কার্বোহাইড্রেট (কার্বন উৎস) সরবরাহের মাধ্যমেও কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের কার্বোহাইড্রেট যেমন-মোলাসেস, আটা, ময়দা, চালের কুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

১২.৮ বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

- উপকারী ব্যাকটেরিয়ার উৎসঃ বায়োফ্লক পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ন উপাদান উপকারী ব্যকটেরিয়া যা মাছচাষের ফলে উৎপাদিত বর্জ্যকে প্রোটিন সমৃদ্ধ জৈব খাবারে তৈরি করে। তাই সঠিক উৎস হতে প্রোবায়েটিক ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করতে হবে।
- নিয়মিত পানির গুনাগুন পরীক্ষা: নিয়মিত ট্যাংকে সরবরাহকৃত পানির গুনাগুন যেমন-অ্যামেনিয়া, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, ফ্লকের ঘনত্ব ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে এবং এগুলো যদি সঠিক মাত্রায় না থাকে তাহলে প্রয়োজণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিঃ পর্যাপ্ত ফ্লকের বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ জনবল: বায়োফ্লকের মাধ্যমে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন।
- সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ: সর্বোচ্চ এক ঘন্টা ট্যাংকে অক্সিজেন সরবরাহ না করা হলে সব মাছ মারা যেতে পারে। তাই বিদ্যুৎ সংযোগের পাশেপাশি আইপিএস কিংবা জেনারেটরের মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উপসংহার (Conclusion) ঃ

বায়োফ্লক প্রযুক্তি একটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পদ্ধতি। পানি পরিবর্তন করতে হয় না বিধায় এই পদ্ধতি পানি সাশ্রয়ী এবং এতে জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। পুকুর বা ট্যাংকেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয় বিধায় এই পদ্ধতি পবিেশবান্ধব। তাছাড়া বর্জ্য থেকে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হয় বলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করেই কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায়। প্রচলিত চাষ পদ্ধতির চেয়ে এতে উৎপাদনও অনেক বেশি হয়। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে যেহেতু ভূমি ও পানির সংকট রয়েছে, সেহেতু এই পদ্ধতিতে মাছচাষ খুবই উপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে প্রচলিত প্রজাতির ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উন্নয়নের যথাযথ গবেষনার প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে যথাযথ গবেষণা তথ্য ছাড়াই এই প্রযুক্তিতে দেশে মাছ চাষের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যথাযথ গবেষনালব্ধ জ্ঞান ছাড়াই এ প্রযুক্তিতে মাছচাষ করে ব্যর্থ হলে প্রযুক্তিটি সম্পর্কে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষ বিষয়ে গবেষনা কার্যক্রম হতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষনা ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এই প্রযুক্তিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হয়। কৃষির মতো মৎস্যখাতে সুলভে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা গেলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। অতএব একটি টেকসই লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি হিসেবে বায়োফ্লক প্রযুক্তি ভবিষ্যতে মৎস্যচাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়।

অধিবেশন ১৩

গুড একুয়াকালচার প্রাক্টিস

GOOD **AQUACULTURE PRACTICE**

১৩.১ উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন

গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস (জিএপি) বা উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন হলো "চাষ, আহরণ ও আহরনোত্তর পর্যায়ে আর্ন্তজাতিকভাবে গৃহীত নিয়মাবলী অনুসরন করে দূষনমুক্ত ও নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা"। তবে গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস (জিএপি) অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য এবং পরিবেশ সহনীয় হতে হবে। সামগ্রিকভাবে খামার পরিকল্পনা, পুকুর তৈরি, পোনার মান, খাদ্য ও পানির গুনাগুন ব্যবস্থাপনা, আহরণ, আহরনোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সবই গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস (জিএপি) এর আওতায় আসে।

১৩.২ উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন (জিএপি) অনুসরন কেন প্রয়োজন

২০০৪ সালের পর থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের গলদা চিংড়িতে নাইট্রোফুরান নামক নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকের অবশেষ(রেসিডিউ) শনাক্ত হওয়ায় ক্রমাগত পন্য ফেরৎ আসা শুরু হয়। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০০৯ সালের মে মাস পর্যন্ত সময়ে ৪০টির অধিক চিংড়ির চালান ফেরত আসার ফলে সমস্যাটি দেশের চিংড়ি শিল্পের জন্য অসহনীয় অবস্থার তৈরী করে। সমস্যাটির এক ধরনের সমাধানের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত দেশে সমূহে ৬ মাসের জন্য গলদা চিংড়ি রপ্তানি স্থগিত করে। এ সময়ে সমস্যাটির উৎস্য সনাক্তকরনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা করে এটি প্রমানিত হয়েছে যে, সমস্যার উৎস্য হলো চিংড়ি খামার এবং চিংড়ি খামারে বিদ্যমান চাষ ব্যবস্থাপনা।

চিংড়ি চাষ পর্যায়ে ফিল্‌থ, স্যালমোনেলা, নাইট্রোফুরান এবং অন্যান্য রাসায়নিক দূষনের সমস্যাকে মোকাবিলার জন্য তাই চাষ ব্যবস্থাপনার বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই এবং একমাত্র গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস(জিএপি) বা "উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা" এর নির্ধারিত গুড প্রাকটিস অনুসরণ করেই তা সম্ভব।

গুড একুয়াকালচার প্রাকটিস(জিএপি) এর উদ্দেশ্য নিম্নরুপ

১। ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা;

২। মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন রোগজীবানু দ্বারা মাছ ও চিংড়ি যাতে সংক্রমিত না হয তার ব্যবস্থা গ্রহন করা;

৩। ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক যেমন- নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল বা কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা কীটনাশক দ্বারা চিংড়ি দূষিত হবে না; এবং

৪। চিংড়ি চাষের শুরু থেকে আহরণ ও আহরনোত্তর পরিচর্যা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে চাষীর এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহন না করা যাতে উৎপাদিত চিংড়ি মানব স্বাস্থের জন্য ঝুকিপূর্ন হতে পারে।

নিরাপদ চিংড়ি ঃ

নিরাপদ চিংড়ি হলো খামারে উৎপাদিত চিংড়ি সম্পূর্ন দূষণমুক্ত এবং তাতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো উপাদান না থাকা। এক্ষেত্রে একজন চিংড়ি চাষীকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তার চাষ পদ্ধতি সম্পূর্ন ত্রুটিমুক্ত ছিল এবং তাতে পন্য দূষনের কোনো উপাদান ছিল না।

ঘেরে নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন বিঘ্নিত হবার কারন ঃ

ঘেরে বা খামারে নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন নিম্নলিখিত কারনে বিঘ্নিত হতে পারে ঃ

- ঘেরে রোগাক্রান্ত পিএল মজুদ।
- রোগজীবানু সংক্রমণ ঘটতে পারে এমন কোনো উপাদান যেমন- মানুষের মলমূত্র, গোবর, হাস-মুরগীর বিষ্ঠার ব্যবহার।
- চিংড়ি চাষে নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন- ম্যালাকাইট গ্রীন, মিথিলিন ব্লু, কীটনাশক এবং অ্যান্টিব্যায়োটিক যেমন- নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদির ব্যবহার।
- অননুমোদিত ঔষধ বা রাসায়নিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।
- ঘেরে জীবানুবাহী অবাঞ্ছিত প্রানী যেমন- কুকুর, বিড়াল, ইদুর, বেজি, ভোদড় ইত্যাদির প্রবেশ, বিচরণ এবং ঘেরের পাশে গবাদিপশু পালন।
- খামারে ব্যবহৃত চিংড়ি খাদ্য উপকরনে ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি।
- ঘেরের পানিতে ভারী ধাতু যেমন- জিংক, ক্রোমিয়াম, লেড, মার্কারী, কোবাল্ট, ক্যাডমিয়াম ও আর্সেনিক ইত্যাদির পরিমান অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশী থাকা।
- ঘেরে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো।
- দূষিত পানিতে কিংবা অস্বাস্বকর পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ও আহরণ।
- চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ করা।
- অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত ঔষধের অবশেষ নিঃশেষের সময়কাল অনুসরণ না করে চিংড়ি আহরণ করা।

ঘেরে অনিরাপদ চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

- অনেক চাষী না জেনে অননুমোদিত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি চিংড়ি চাষে ব্যবহার করে থাকে। ব্যবহৃত এসকল রাসায়নিকের অবশেষ চিংড়ি দেহে থেকে যায়, যা ভোক্তার স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে থাকে;
- অননুমোদিত অ্যান্টিব্যায়োটিক যেমন-নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন- ম্যালাকাইট গ্রীন, মিথিলিন ব্লু ইত্যাদির সামান্য উপস্থিতিও মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে;

- প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি পন্যে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া যেমন- স্যালমোনেলা, ভিব্রিও, ই.কোলাই এর সংক্রমণ মূলত ঘের থেকেই আসে। ঘেরের পানিতে এ সকল ব্যাকেটেরিয়ার উপস্থিতির কারনে খাদ্য হিসাবে চিংড়ি অনিরাপদ হয় এবং
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আহরনোত্তর পরিচর্যার কারনেও চিংড়ি খাদ্য হিসেবে অনুপযুক্ত হয়।

ঘেরে নিরাপদ ও গুনগত মান সম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদনে চাষীদের করনীয়

- চিংড়ি চাষীকে সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত পি.এল. মজুদ নিশ্চিত করতে হবে;
- দূষন ও সংক্রমন প্রতিরোধের জন্য ঘেরে অবাঞ্ছিত প্রানীর প্রবেশ বন্ধ করতে হবে;
- খাদ্য ব্যহারের ক্ষেত্রে খাদ্যের গুনগতমান নিশ্চিত হয়ে এবং লেবেলিং দেখে ভাল মানের খাদ্য ক্রয় করতে হবে এবং নিয়মিত ও প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে হবে;
- খাদ্য সংরক্ষনের স্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাসযুক্ত ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে;
- পচা, বাসী, মেয়াদ উর্ত্তীণ ও নিম্নমানের খাদ্য ব্যবহার করা যাবে না;
- মজুদকৃত খাদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'আগের খাদ্য আগে' ব্যবহার করতে হবে;
- তেলাপোকা, ছুচো, ইদুর, বেজি, ভোদর বা এ জাতীয় প্রানী যাতে খাদ্য গুদামে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে;
- অননুমোদিত ও নিষিদ্ধ ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে;
- চিংড়ি চাষ ও চিংড়ি খাদ্যে কোন লেবেল বিহীন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না;
- ঘেরের পানির গুনাগুন চিংড়ির জন্য সবচেয়ে অনুকূল মাত্রায় রাখতে হবে;
- অহরনের ৭-১০দিন পূর্বে চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে;
- সকালে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরন করতে হবে;
- আহরিত চিংড়ি ছায়াযুক্ত স্থানে পরিস্কার পলিথিন বা প্লাস্টিকের বাস্কেটে রাখতে হবে। আহরনের সাথে সাথে ভালমানের পর্যাপ্ত বরফ দিয়ে চিংড়ি সংরক্ষন করতে হবে;
- দূষন এড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিংড়ি পন্য সংরক্ষন ও পরিবহন করতে হবে;
- ঘেরে ব্যবহৃত সকল উপকরন যেমন- পোনা, খাদ্য, ঔষধ এবং রাসায়নিক দ্রবাদির নাম, উৎস্য, মাত্রা, ব্যবহারের কারন ও তারিখ ইত্যাদি খামারের রেকর্ড বইয়ে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষন করতে হবে;
- ঘের মালিক ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্মতভাবে ঘের পরিচালনা, পোনা ও পন্য পরিবহন, পরিচর্যা, সংরক্ষন এবং ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষন গ্রহন করতে হবে;
- ঘেরে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি যেমন- জাল, বাস্কেট, বালতি, গ্লোভস্ সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি পরিস্কার পানি দিয়ে ধৌত করে জীবানুমুক্ত করতে হবে এবং
- ক্রস দূষন এড়াতে খামারে ব্যবহৃত লুব্রিকান্ট, জ্বালানী তেল, অনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি পৃথকভাবে সংরক্ষন করতে হবে।

ঘের বা খামারে অনুসরনীয় প্রধান প্রধান গুড প্র্যাকটিস ঃ

প্রত্যেক চাষীকে চিংড়ি চাষের প্রত্যেক পর্যায়ে নিম্নবর্নিত গুড প্র্যাকটিস অনুসরন করতে হবে-

খামারের অবস্থান সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস ঃ

- আশেপাশের বাড়িঘর, গৃহপালিত পশুর খামার, আবর্জনা ইত্যাদি হতে ঘের দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন স্থানে ঘের নির্মান করতে হবে;
- ঘের নির্মানের সম্ভাব্য স্থানে অতীতে কীটনাশক, ভারী ধাতু ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং বর্তমান মাটিতে তার কোন অবশেষ বিদ্যমান আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে; এবং
- ক্ষতিকর জীবানু আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে।

চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত পানি সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস ঃ

- পাশ্ববর্তী নদী, খাল, বিল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে ঘেরে পানি দূষনের সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে হবে;
- ঘেরের পানিতে ক্ষতিকর জীবানু (কলিফর্ম, স্যালমোনেলা) ভারী ধাতু (জিঙ্ক, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, লেড, কোবাল্ট, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম) কীটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি আছে কিনা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে;
- কলকারখানার ও নর্দমার দূষিত পানি ঘেরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে;
- ঘেরে বৃষ্টির পানি গড়ানো প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

খামারের আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস ঃ

- বন্যাপ্রবন, ময়লা-অর্বজনা স্তুপের আশেপাশে খামারের স্থান নির্বাচন করা যাবো না;
- ঘেরের আশেপাশে ঝোপঝাড়, জলজ আগাছা, ময়লা আবর্জনা যা ক্ষতিকর জীবানুবাহী প্রানীকে আকৃস্ট করতে পারে তা পরিস্কার করতে হবে;
- ঘেরের পারে বা আশে-পাশে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না;
- ঘেরে পশু পাখীর বিচরন বন্ধ করতে হবে।

চিংড়ি খামারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস ঃ

- খামার প্রাঙ্গন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি(জাল, বাকেট, বাস্কেট ও অন্যান্য সরঞ্জাম) পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে;
- কারন, নোংরা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ময়লা ও পূর্বের মরা চিংড়ি থেকে নতুন চিংড়িতে জীবানু সংক্রমন ঘটতে পারে;
- একবার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পূনরায় ব্যবহারের পূর্বে জীবানুমুক্ত করতে হবে। এক খামারের যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত না করে অন্য খামারে ব্যবহার করা যাবে না;
- খামারে কর্মচারী ও মানুষের যথেচ্ছ প্রবেশ নিয়ন্ত্রন করতে হবে;
- খামারে কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে;

- চিংড়ি ধরা ও চিংড়ি রাখার কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলিকে ভালভাবে পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে। কারন নোংরা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ময়লা ও পূর্বের মরা চিংড়ি থেকে নতুন চিংড়িতে জীবানু সংক্রমন ঘটতে পারে। চিংড়ি রাখা এবং পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত সকল বাস্কেটসহ অন্যান্য পাত্রকে যথাযথভাবে পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে;
- গৃহপালিত পশুপাখীর গোবর বা বিষ্টা সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা; এবং
- ঘেরে কর্মরত লোকজনকে ঘের বা পানির উৎস সংলগ্ন এলাকায় মলমূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না।

চিংড়ির খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতার গুড প্র্যাকটিস

- কেবল নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পুস্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে; খাদ্যের মান ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে ২-৩ মাসের মধ্যে মজুদকৃত খাবার ব্যবহার করতে হবে;
- খাদ্যের ব্যবহৃত উপকরনের গুনগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং তাতে ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক বা রাসায়নিক পদার্থ উপস্থুতি আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে;
- চিংড়ির বর্ধনের জন্য হরমোন জাতীয় কোন উপাদান খাদ্যে ব্যবহার করা যাবে না;
- পুরানো মেয়াদোত্তীর্ন, দুর্গন্ধ ও ছত্রাকযুক্ত নিম্নমানের খাবার ব্যবহার করা যাবে না;
- কাঁচা খাবার সরাসরি ঘেরে ব্যবহার করা যাবে না;
- পরিস্কার, শুস্ক ও ঠান্ডা পরিবেশে পাকা মেঝে প্লাটফর্মের উপর খাদ্য সংরক্ষন করতে হবে; এবং
- খাদ্য গুদামে জীবানুবাহী তেলাপোকা, ছুচো, ইদুর, বেজি, পাখি ইত্যাদির প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

ঔষধ ব্যবহার সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস

- কেবল সর্বশেষ উপায় হিসেবে অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে;
- ঔষধ সংরক্ষনে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
- সঠিক ব্যবহার বিধি অনুসরন করে ঔষধ ব্যবহার করতে হবে;
- ঔষধ ব্যবহারের তথ্য সংরক্ষন করতে হবে;
- অবশেষ নিঃশেষের সময় মেনে চলতে হবে।

চিংড়ির আহরণ সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস ঃ

- চিংড়ি আহরনের পূর্বে ক্ষতিকর জীবানু (স্যালমোনেলা, কলেরা, ই.কোলাই) ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে;
- আহরনের ২ দিন আগে থেকে খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে;
- ভোরে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরন করতে হবে;
- চিংড়ি সংরক্ষনে সুপেয় পানি দিয়ে তৈরী বরফ ব্যবহার করতে হবে;
- আহরিত চিংড়ি বরফ ঠান্ড পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। আহরনের সাথে সাথে প্রতি কেজি চিংড়িতে এক কেজি বরফ দিয়ে সংরক্ষন ও দ্রুত পরিবহন করতে হবে;
- বরফ পরিবহনে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি জীবানুমুক্ত রাখতে হবে।

চিংড়ি চাষের সামাজিক ও পরিবেশগত গুড প্র্যাকটিস ঃ

- ঘেরের জমির বৈধ মালিকানা থাকতে হবে;
- আশেপাশের জলজ ও স্থলজ পরিবেশ এবং বন্যপ্রানীর আবাসস্থল নস্ট করতে পারে এমন জায়গায় ঘের তৈরী করা যাবে না;
- উপকূলীয় ম্যনগ্রোভ বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক জলাভূমি ধ্বংস করে ঘের তৈরি করা যাবে না;
- গুরুত্বপূর্ন পানির প্রবাহকে পরিবর্তন করতে পারে এমন জায়গায় চিংড়ি চাষ করা যাবে না;
- আশেপাশের জনগোষ্ঠির জীবন জীবিকা ও যাতায়াত ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন জায়গায় চিংড়ি চাষ করা যাবে না;
- ঘেরের কারনে যাতে মাটি ও আশেপাশের জলাশয়ের লবনাক্ততা বৃদ্ধি না পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে;
- খামারের কালোমাটি ও বর্জ শোধন না করে বাইরে কোথাও ফেলা যাবে না।

চিংড়ি চাষে শ্রম অধিকার ও শিশু শ্রমের ব্যবহার সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস ঃ

- চিংড়ি চাষের সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের ন্যায় একই কারনে শ্রম অধিকার ও শিশু শ্রমের বিষয়টি সমান গুরুতপূর্ন। শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশু শ্রম নিয়ন্ত্রনের জন্য দেশে " শ্রম অইন ২০০৬" বিদ্যমান আছে। আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-
- শ্রমিকের লিখিত নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র দিতে হবে;
- শ্রম আইনের বিধান অনুসারে খামারে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে;
- শ্রমিকদের ঘোষিত নূন্যতম মজুরী ও প্রাপ্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে;
- দূর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু বা পঙ্গু হলে ক্ষতিপূরন দিতে হবে;
- খামারে ১৪ বছরের কম বয়সের কোন শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না;
- দিনে ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করালে ওভারটাইম দিতে হবে; এবং
- সপ্তাহে ১দিন সাধারন ছুটি দিতে হবে।

উল্লেখযোগ্য গুড প্র্যাকটিসেস
Major Good Practices

ঘেরের তলা ভালভাবে শুকিয়ে প্রয়োজনমত চুন ব্যবহার করুন

নার্সারির পানিতে খাপ খাওয়ানোর পর পোনা মজুদ করুন

মানসম্মত চিংড়িখাদ্য ব্যবহার করুন

নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করুন

নিয়মিত চিংড়ির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করুন

চিংড়ি আহরণ করে প্লাষ্টিক শীটে রাখুন এবং সাথে সাথে পর্যাপ্ত বরফ দিয়ে দ্রুত পরিবহন করুন

উপসংহার

নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের বিষয়টি এখন আর শুধু আহরনোত্তর পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। খামারে মাছ উৎপাদনের প্রতিটি স্তর এমন কি ব্যবহৃত উপকরনসমূহের উৎসে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রন নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়ার সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। ইতোপূর্বে মাননিয়ন্ত্রের জন্য আমাদের দেশে মাছ চাষ পর্যায় অপেক্ষা আহরননোত্তর পর্যায়কেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী নিরাপদ খাদ্যের মানদন্ডে ক্রমাগত পরিবর্তন আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিরাপদ খাদ্যের মানদন্ড হিসেবে খামারে উৎপাদন পর্যায়ে সকল প্রকার দূষন রোধ গৃহীত ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষন ও শ্রমিক কল্যান যুক্ত হয়েছে। আর এজন্য নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করতে উত্তম চাষ অনুশীলন (জিএপি) বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

অধিবেশন - ১৪

প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

১৪.১: প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ঃ

প্লাবনভুমি বলতে বন্যা প্লাবিত ভূমি যেখানে একাধারে বছরের ৪-৬ মাস মাছ চাষ উপযোগী পানি থাকে তাকেই বুঝায়। এ ধরনের প্লাবনভূমি আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যত্রতত্র দেখা যায়। বাংলাদেশে উম্মুক্ত জলাশয়ের শতকরা ৬৮.৯২ ভাগই হচেছ প্লাবনভুমি যার আয়তন প্রায় ২৭.০৪ লক্ষ হেক্টর। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০% আহরিত হতো অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় হতে। বর্তমানে অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় থেকে উৎপাদিত মাছের শতকারা হার প্রায় ২৮ শতাংশ। বিগত কয়েক দশকের মৎস্য উৎপাদন চিত্র বিশ্লেষনে দেখা যায় যে অভ্যন্তরীন বদ্ধ জলাশয়ের মাছের উৎপাদন বহু গুন বৃদ্ধি পেলেও মুক্ত জলাশয় থেকে মাছের উৎপাদন দিনের পালাক্রমে ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে।

উপকূলীয় জেলা এবং পার্বত্য জেলা ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সব জেলাতেই প্লাবনভূমির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এসব প্লাবনভূমিতে পানির গভীরতা প্রায় ৩-৫ফুট হয়ে থাকে যার কারণে বর্ষায় এসব জমিতে ধান চাষ হয়না বললেই চলে। তাছাড়া ৪-৬ মাস পানি থাকে বিধায় এসব জলায় মাছ থাকাটাই স্বাভাবিক। সত্তর দশকে এসব জলামগ্ন জমিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আর সে কারণে তখনই ছিলাম আমরা সত্যিকারের ‘মাছে ভাতে বাঙ্গালি’। বাড়ির পাশের ডোবানালা থেকে মাছ ধরে খাওয়াটাই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে মাছ আহরণ ও নানাবিধ কারণে সে ঐতিহ্য ধরে রাখা যায়নি। ফলে লোভনীয় সব দেশীয় প্রজাতির মাছ যেমন-শোল, রোয়াল, টাকি, কৈ, টেংরা, পুঁটি, মাগুর, মেনি, বাইম ইত্যাদি এখন বিপদের সম্মুখীন। তাই প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনাই কেবল মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৪.২: প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন হ্রাসের কারণ ঃ

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় এদেশের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ষোল কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্টির পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে উন্মুক্ত জলাশয় তথা প্রাকৃতিক জলাশযে মাছের উৎপাদন ক্রমশ: কমে যাচ্ছে। যেমন:-

১৪.২.১ : প্রাকৃতিক কারণ ঃ

- নদী নালা ও খাল বিলে পলি জমা ;
- নদ নদীর নাব্যতা হ্রাস ;
- বর্ষকালের স্থায়িত্ব সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি ;

১৪.২.২ : মনুষ্যসৃষ্ট কারণ ঃ

- খাল বিল ও নদী নালায় অতি মাত্রায় মাছ আহরণ ;
- ছোট ছোট ও ডিম ওযালা মাছ নির্বিচারেআহরণ ;
- জলাশয় শুকিয়ে মাছ আহরণ ;
- জলাশয় ভরাট করে বসবাসের বাড়ি বা শিল্প ক্রখানা গড়ে তোলা ;
- যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণ করে মাছের চলাচল পথ বন্ধ করা বা বাধাগ্রস্থ্যকরা ;
- প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংশ করে মাছের বংশ বিস্তার রোধ করা ইত্যাদি ; এবং
- কৃষি জমিতে নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার।

১৪.৩: প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ঃ

একটি প্লাবনভূমি এলাকায় যত লোকের জমি থাকে অর্থাৎ জমির মালিক এবং যে সমস্ত লোক এই প্লাবনভূমিকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে যেমন- জেলে, দিনমুজুর, ভূমিহীন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ সকলের অংশগ্রহণে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি, তাকেই প্লাবনভুমিতে সমাজভিক্তিক মাছচাষ বলা হয়। এধরনের মাছ চাষে সমাজের সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে। এতে করে জনগণ কেবল অর্থনৈতিকভাবে লাভবানই হয় না, সমাজ জুড়ে ব্যাপক ইতবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়।

সামাজিক মাছ চাষ কর্মসূচি শুধুমাত্র সামাজভিত্তিক মৎস্য উন্নয়ন নয়। সামাজিক মাছ চাষ কার্যক্রমে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির কার্যকরী অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এতে কর্মসূচি এলাকার সমাজের মানুষের মধ্যে আত্ম-মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমাজে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া, ভূমিহীন, বিত্তবান ও বিত্তহীন সকলেই সমানভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অংশীদারীত্বের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে পারে।

প্লাবন ভূমিতে সমাজ ভিক্তিক মাছ চাষের সুফল ঃ

- বন্যাপ্লাবিত ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- স্থানীয় সম্পদ ও পুঁজির সমন্বয় সাধন।
- মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধমে আমিষের চাহিদা পূরণ।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্য বিমোচন।

- ➢ আইন শৃঙ্গখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি।
- ➢ সংশ্লিষ্ট ধানী জমিতে ধানের ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস।
- ➢ সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য হ্রাস এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি।
- ➢ কম খরচে অধিক মাছের উৎপাদন।
- ➢ অল্প সময়ে অধিক মুনাফা অর্জন।
- ➢ অবকাঠামোর উন্নতি।
- ➢ বাজার ব্যবস্থার উন্নতি।

প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের ফলে পারিবারিক আয় ক্ষেত্র বিশেষে ১৮৬% পর্যন্ত বৃদ্ধিপায় যা পারিবারিক আয় বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় যাতে করে স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট ধানী জমিতে সমন্বত বালাই ব্যবস্থাপনার ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় ও ধানের উৎপাদন ১০-১৫% বেড়ে যায়।

কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমে। বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার পর পানি শুকিয়ে মাছ ধরা হয় না অর্থাৎ স্থানীয় উদ্যোগে ছোট ছোট অস্থায়ী অভয়াশ্রমের মত মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হয়। এভাবে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের, সম্মিলনে সংরক্ষেণের একটি সহায়ক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

১৪.৪: প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সম্ভাবনা ঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৭.০৪ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমি রয়েছে। এসব প্লাবনভুমিতে বর্তমানে মাছ পাওযা যায় প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫০ কেজি। এসব বর্ষা মৌসুমে পরিত্যাক্ত বা অনাবাদী হিসাবে পড়ে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে ধান চাষ হয়। র্অথাৎ এ গুলো এক ফসলী জমি হিসাবে গণ্য হয়। অতি সম্প্রতি এসব প্লাবনভুমিকে মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে।

এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে সবচেয়ে ভাল ফল পাচ্ছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি এলাকার চাষিরা । সত্যিকথা বলতে গেলে দাউদকান্দি উপজেলাই প্লবনভূমিতে মাছ চাষের পথিকৃত। কুমিল্লার মুরাদনগর , তিতাস, হোমনা, চান্দিনা ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় একই পদ্ধতিতে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের প্রসার ঘটছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি পরামর্শে দাউদকান্দি উপজেলায় বর্ষা প্লাবিত জলাশয়ে সামাজিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ৪-৬ মাস চাষ ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনে হেক্টর প্রতি গড়ে প্রায় ২২০০ (২০০২-২০০৩) কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। কোনো কোনো প্লাবনভূমিতে প্রতি হেক্টরে ৩.০০-৪.০০ মে.টন মাছও উৎপাদিত হচ্ছে। একই সাথে প্রাকৃতিক মাছের প্রজাতি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন ০.২ মেঃটন/হেক্টরে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে বর্তমানে প্লাবনভূমি এলাকায় মাছের গড় উৎপাদন ০.২৬৫ মেঃটন/হেক্টর। প্লাবনভূমিকে কীভাবে মাছ চাষের খনি বানানো যায় সে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সারাদেশ থেকে উৎসাহী লোকজন ভিড় জমাচ্ছে এসব এলাকায়। একই অভিজ্ঞতা নিয়ে যশোরের ভবদহ অঞ্চলের অধিবাসীরা ভবদহের দুঃখ হিসেবে খ্যাত তাদের জলাবদ্ধ এলাকাকে এখন মাছের খনিতে রূপান্তরিত করেছে। এছাড়া রাজশাহী, নাটোর , গাইবান্ধা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলাতেও প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের প্রসার ঘটেছে। যদি পর্যায়ক্রমে ৫০% প্লাবনভূমিতে পরিকল্পিতভাবে সামাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে শুধুমাত্র এ উৎস থেকেই অতিরিক্ত প্রায় ৩০.০০ লক্ষ মেঃটন (হেক্টর প্রতি ২.৩ মেঃটন+ প্রকৃতিক মাছের প্রজাতি সংরক্ষনের মাধ্যমে প্রকৃতিক মাছের উৎপাদন ০.২ মেঃটন /হেক্টর = ২.৫ মেঃটন/ হেক্টর)

অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করা সম্ভব, যা বর্তমানে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮৫% । আর সে কারণেই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের বিস্তৃত প্লাবনভূমিতে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম গ্রহন করা অতীব জরুরী। এজন্য প্রয়োজন প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ উপযোগী অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও প্রনোদনামূলক (Motivation) কার্যক্রম গ্রহন। আর এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী অবদান রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আর তাই প্লাবনভূমিতে কার্যকর দল গঠনের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১৪.৫ প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ঃ

সামাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচী শুরুর প্রারম্ভেই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা করতে হবে। পরিকল্পনায় কোন কোন রাস্তা অন্তর্ভূক্ত হবে, বন্যা পরিস্থিতি কেমন হতে পারে, ব্যবস্থাপনা সুবিধা কতটুকু পাওয়া যাবে, শূষ্ক মৌসুমে পানির যোগান কেমন থাকবে, কৃষি জমির ফসলের জন্য কোন সময় পানি সরিয়ে দিলে চলবে, বাজারজাতকরণ সুবিধা কেমন পাওয়া যাবে, এ সকল যাবতীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সমস্যা সমাধানের উপায় সমন্ধে নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনার লক্ষ্য থাকবে টেকসই, অল্প খরচ, ঝুঁকিহীন, কমিউনিটির সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তি এবং মাছ চাষের ব্যবস্থাসহ প্রাকৃতিক মাছ সংরক্ষণের সর্বাধিক উপযোগী একটি লাভজনক কর্মসূচি গ্রহণ করা। অতএব কম সংখ্যা/পরিমানে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। প্লাবনভূমিতে সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচিততে যে ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন হতে পারে তা হলো– **১.** বাঁধ ও রিজার্ভার, ২. কালভার্ট, স্লুইচ গেট, লোহার নেট, ৩. অভয়াশ্রম / মাছের প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য সাংবার্ষিক জলাশয় তৈরী।

অবকাঠামো নির্মাণে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ঃ

ক) প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান ঃ

নদীর সাথে সরাসরি সংযোগ আছে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন এলাকায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হলে সাধারণ বন্যাকে বিবেচনা করেই বাঁধের উচ্চতা ও বেজ নির্ধরণ করা উচিৎ। এলাকার বিভিন্ন স্থাপনা বা বৃক্ষের কোন পর্যায়ে বিভিন্ন বন্যায় পানি উঠেছিল তা নিয়ে আলোচনা করলেই পানির উচ্চতা জানা যাবে। অধিক সতর্কতার জন্য অস্বাভাবিক বন্যা মোকাবেলায় প্রথম বছর ব্যয় সংকোচন করে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে রাখা উচিৎ।

খ) পানির চাপ, বাতাসের গতিবিধি ঃ

খাল/ নালার অবস্থান বিবেচনা করলেই কর্ম এলাকার কোন অংশে পানির চাপ, বাঁধের কোথায় গুরুত্ব দিতে হবে তা বোঝা যায়। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাসে বৃহদাকার বদ্ধ এলাকায় বেশী ঢেউ হবে ফলে বাঁধের ক্ষয় হবে এবং বাঁধ ভেঙ্গে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। সরাসরি পূর্ব-পশ্চিম বাঁধ উপেক্ষা করা ভাল। নিতান্ত প্রয়োজন হলে এই বাঁধ মজবুত এবং রক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গ) বাঁধের কারণে আশেপাশে জলবদ্ধতা ঃ

সামাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় বাঁধ নির্মানের ফলে আশে পাশের এলাকায় যাতে জলবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ঘ) বর্ষাকালীন যাতায়াতের গুরুত্ব ঃ

বাঁধ যাতে সর্বাধিক যাতায়াত সমস্যা মিটাতে পারে সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে। অবশ্য এ দিকটা দেখতে গিয়ে মূলধন বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসূচিকে অলাভজক করা যাবে না বরং ভবিষ্যতে কর্মসূচির লাভ থেকে এ ধরনের কল্যানমূলক কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ রেখে পরিকল্পনা করা উচিৎ।

নির্মাণ পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয় ঃ

অবকাঠামো পরিকল্পনায় সব সময় জনগোষ্ঠির সর্বোচ্চ সামাজিক সুবিধা বিধানের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বাঁধ/ কালভার্ট বা স্থাপনা জনিত ব্যয় কর্মসূচির মোট মূলধন ব্যয়ের ৪০% নিচে রাখতে পারলে খুব ভালো হয়। কর্মসূচির জন্য যত কম দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া যায় তত ব্যয় সাশ্রয় হয়। এ জন্য সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচির স্থান নির্বাচনে চার পাশে সরকারী রাস্তার অবস্থান, গ্রামগুলোর অবস্থান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ। সরকারী রাস্তা ও গ্রামগুলো একটির সাথে আরেকটির সংযোগ করে কম খরচে বাঁধ করা যায়। গ্রামগুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থান করলে, বাধের জন্য খরচ বোশী হয়ে যাবে। কর্ম এলাকার আয়তন খুব বেশী বড় হলে ব্যবস্থাপনায় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের সম্মতকরণ ঃ

কর্মসূচির আওতায় সকল জমির মালিকের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের সম্মতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। কখনও জোর জবরদস্তি করা যাবে না । প্রত্যেক জমির মালিকের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। মাটি কাটা এবং বাঁধ নির্মাণে ফসলের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে।বাঁধ নির্মাণের আগে বাঁধের জমি ও বাঁধের জন্য মাটি কাটার জমিগুলো চিহ্নিত করে খুঁটি পুঁতে দেওয়া উচিৎ। এতে করে যাদের জমি তারা অসম্মত থাকলে প্রতিবাদ করবে। তখন তাদের সাথে আবার বসতে হবে, বোঝাতে হবে। যাদের জমি কাটা যাবে বা বাঁধের নিচে যাদের জমি যাবে মালিকানা হারাবে এমন অমূলক ভয়ে কেউ কেউ অসম্মত থাকতে পারে। এদের সাথে বারবার সভা করে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, কর্মসূচির আওতায় জমি গেলে কৃষকদের জমির মালিকানায় এতটুকুও পরিবর্তন ঘটে না বরঞ্চ বাঁধের নিচে যাদের জমি যাবে তাদের মুনাফা অন্যন্যদের তুলনায় বেশী হবে। কর্ম এলাকার বাঁধে বনায়ন করলে তার একটা ভালো হিস্যা পাওয়া যায় যা তাদের জন্য আরেকটি অতিরিক্ত লাভ। পুরাতন ডোবা, পাকুর বা খালগুলোর প্রাক ৩ বছরের আয়ের গড় হিসাব করে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং মালিকদেরকে সম্মত করে কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে ফসলের ক্ষতিপূরণ কর্মসুচির একটি উৎপাদন ব্যয়ই বটে।

অবকাঠামো নির্মাণ

বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ

বন্যা নিয়ন্ত্রন বা সেচ প্রকল্প, কৃষি প্রকল্প, মৎস্য চাষ প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়নে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রধানত বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সুতরাং বাঁধ নির্মাণের জন্য কিছু কিছু কারিগরি দিক বিশেষভাবে গুরুত্ব সহকারে

নজর দেয়া দরকার। অন্যথায় সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল উদ্ধেশ্য ব্যহত হতে পারে। তাই বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে-

- বাঁধ নির্মাণকালে বাঁধের উচ্চতা নূন্যতম পানির উচ্চতা থেকে ২/৩ ফুট উপরে রাখতে হয়। উচ্চতা, মাটির প্রকারভেদ বা ভৌগলিক অবস্থানভেদে বাঁধের স্লোপ/ঢাল ৩ঃ১, ২ঃ১ বা ১ঃ১ হতে পারে। উচ্চতা বোশী হলে অনেক সময় দুই বা ততোদিক ধাপে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এতে বাঁধের স্থায়ীত্ব বাড়ে। চাঁদি বা টপ ১০ ফুটের উপরে হওয়া যুক্তিযুক্ত।
- বাঁধ হতে মাটি কাটার গর্ত বা বরোপিটের দূরত সাধারণত ১০ ফুট রাখা উচিৎ। তবে বাঁধের উচ্চতা, স্লোপ কম হওয়া সাপেক্ষে কমও হতে পারে। সাধারণত বাঁধের চালের সমান বরোপিটের ঢাল রাখা প্রয়োজন বা নূন্যতম ১ঃ১ রাখতে হবে।
- বাঁধের কাজ এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। এপ্রিল মাসের শেষার্ধ থেকেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা প্রচুর। বৃষ্টি শুরু হলে বাঁধের কাজ বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া এ সময় মাটির কাজের শ্রমিক পাওয়া যায় না এবং মজুরীও বেশী পড়ে যায়।
- মাটি কাটার কাজের শ্রমিকদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়ে কাজ করাতে হবে। প্রতিটি দলের কাজ একজন সুপারভাইজার (বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য) তদারকি করবেন। চুক্তি ভিত্তিক কাজ করনো ভালো। এতে করে নিজেদের নির্দেশনায় মজবুত বাঁধ করা সম্ভব।
- বাঁধের মাটি পিটিয়ে এবং খুঁচিয়ে যতদূর পারা যায় কমপ্যাক্ট করে নিতে হবে। বাঁধ বা বাঁধের ঢালের স্থায়ীত্বের জন্য প্রয়োজনে ঢাল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় বাঁধের উচ্চতা, ডালে পানি প্রবাহের ধরণ ইত্যাদি বিয়ষ বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের প্রতিরক্ষামূলক কাজ যেমন, টারফিং (ঘাষ লাগানো) ইটের ম্যাট্রিসিং আর, সি, সি ব্লক ম্যাট্রেসিং ইত্যাদি করানো যেতে পারে।
- কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজে বাঁধের ব্যবহার সঠিকভাবে নিশ্চিতকরণে বাঁধের ঢাল, উচ্চতা ঠিকমত বজায় রাখার জন্য সময় সময় প্রয়োজনীয় মেরামত করতে হয়। এছাড়া প্রতিরক্ষামূলক কাজের স্থায়ীত্বের জন্যও মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণ করতে হয়। তাই উক্ত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নিয়মিত ভাবে বাৎসরিক /সাময়িক রক্ষাণাবেক্ষণ কাজ করানো দরকার। এর ফলে বাঁধের স্থায়ীত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

কালভার্ট নির্মাণ

সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচিতে একটি বিশাল প্লাবনভূমিকে বাঁধ দিয়ে একটি বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত করা হয়। বাঁধ বা রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রন করে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার অনুকূলে আনা হলেও যেখানে সামাজভিত্তিক মাছ চাষ হয়নি বা করা সম্ভব নয়, সেখানে কৃষি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বন্যার পানির ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। তাই পানির সহজ গতি ধারাকে ব্যাহত করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া সামাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় অনেক সময় পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই বাঁধের মধ্যে সহজে পানি নিষ্কশনের সুবিধাজনক স্থানে এক বা একাধিক স্লুইচগেটসহ কালভার্ট নির্মাণের প্রয়োজন হতে পারে। কালভার্টগুলো কয়েক রকমের হতে পারে- যেমন বক্স কালভার্ট, আর, সি,সি পাইপ কালভার্ট, অথবা প্লাষ্টিক পাইপ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি। সুষ্ঠুভাবে এগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কালভার্টের অবস্থান, ডিজাইন ও বাজেট প্রনয়ন করিয়ে নেয়া উচিৎ।কালভার্ট নিমার্ণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ:-

- কৃষকের প্রয়োজনে ডিসেম্বর মাসে অতি দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধা রাখতে হবে। আশে পাশের খাল বা নদীর দিকে কালভার্ট থাকা বাঞ্চনীয়। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে একদম খালের পাড়ে যেন কালভার্ট না করতে হয়। এমন হলে মধ্য বর্ষায় প্রচন্ড পানির চাপ ও এর উপরের মাটির চাপে কালভার্ট ধ্বসে যেতে পারে।
- কালভার্ট ও স্লুইচগেট ডিজাইন দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে যাতে কালভার্ট মজবুত হয় এবং গেট সহজে পরিচালনা ও রক্ষাণাবেক্ষণ করা যায়। স্থাপনাগুলোর জন্য উচ্চ মান সমপন্ন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা উচিৎ। ব্যয় সংকোচন করার জন্য এগুলো কমদামী নেয়া কোনক্রমেই যুক্তি যুক্ত নয়।
- কালভার্টের মুখে সঠিক ব্যাসের লোহার নেট স্থাপন করতে হবে, যাতে সহজে প্রাকৃতিক ভাবে মাছের রেনু চলাচল করতে পারে এবং মজুদ সাইজের পোনা বেরিয়ে যেতে না পারে।
- ব্যয় সাশ্রয়ী কালভার্ট তৈরীর পরিকল্পনা করা উচিৎ যাতে কর্মসূচির ব্যয় বেড়ে না যায়।
- যেখানে পানি নিষ্কাশনের ব্যাপক প্রয়োজন নেই বা নির্বাচিত এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের মধ্যে আবস্থিত সেখানে খরচ সাশ্রয়ের জন্য ১০ ইঞ্চি প্লাষ্টিকের পাইপ খুব সামান্য ইটের কাজ করে বসিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়।

১৪.৬ প্রাকৃতিক মাছ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ

অনেকের ধারণা প্লাবনভূমিকে বন্ধ জলাশয় পরিনত করে তাতে মাছ চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক মাছের বিনাশ সাধন করা হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি মোটেই সেরূপ নয়।প্রাকৃতিক মাছ বা জীব বৈচিত্র বিনষ্টের জন্য যে কারণগুলো দায়ী তা হলো-

- মাছের আবাস স্থলের সংকোচন ও অবক্ষয়
- অতি আহরণ
- বিদেশী মৎস্য প্রজাতির বিস্তার
- পরিবেশ দূষণ ও
- জলাবায়ুর পরিবর্তন

জীব বৈচিত্র রক্ষায় প্লাবন ভূমিতে সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। কারণ প্লাবন ভূমিতে বিদ্যমান পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার জলজ প্রাণীর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং নিয়ন্ত্রিত অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতি আহরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সকলের মালিকানা ও অংশ গ্রহণের কারণে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়। জলাবায়ুর পরিবর্তনে, খরায় পানি শুকিয়ে গেলে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করেও প্রাকৃতিক মাছের সংরক্ষণ করা যায়।

প্লাবন ভূমির সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচিতে নিন্মে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহন করলে প্রাকৃতিক মাছ সংরক্ষণ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষন কার্যক্রম বেগবান হবে।

- প্রাকৃতিক মাছ সংরক্ষণ ও জীব বৈচিত্র রক্ষা বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে এলাকার জনগোষ্ঠিকে সচেতন করে তুলতে হবে।

- কালভার্ট, স্লুইচগেট এমন লেভেলে করা উচিৎ যাতে প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশন যেমন হবে তেমনি বর্ষার প্রারম্ভে যখন প্রাকৃতিক মাছের রেনু পানির উপরি স্তরে ভেসে চলে তখন যেন সহজে প্রকল্পে ঢুকতে ও বেরুতে পারে।
- কালভার্টের মুখের লোহার নেটের ফাশ (mesh size) যেন রেনু পোনার চলাচল যোগ্য হয়।
- মাছ যেন পানি শুকিয়ে ধরা না হয়।
- কর্ম এলাকার মধ্যে একাধিক ডোবা বা গর্তকে প্রয়োজন মাফিক গভীর করে অভয়াশ্রমে পরিণত করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ধারা অব্যাহত থাকে। যে সকল মাছ এলাকায় বিলুপ্তির পথে সে মাছগুলোকে সর্তকতার সাথে সংরক্ষণ করে বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে অনুরূপ প্রজাতির মাছ বাহির থেকে এনে মজুদ করতে হবে।

সামাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। পানকৌড়িতে প্রতি বছর ৩০ মে: টন অধিক বিভিন্ন জাতের প্রাকৃতিক মাছ যথা- কই, শিং , মাগুর, শোল, টাকি, মলা, ঢেলা, ট্যাংরা, চাদা, খলিশা, দেশী পুটি, ফলি, আইড়, ইত্যাদি আহরিত হয়। প্রকল্পের বিভিন্ন স্থানের ডোবা বা পুকুরগুলোতে দীর্ঘ সময়ের জন্য এসব মাছের জাত সংরক্ষিত হয়।

১৪.৭ মাছ চাষ কার্যক্রম ঃ

অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ হলে পরিচালনা পরিষদ বিভিন্ন উপ-কমিটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করবেন।

ক) জমি চাষ দেওয়া ও চুন প্রয়োগ ঃ

প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে এপ্রিল-মে মাসে বর্ষা-প্লাবিত হওয়ার আগে ধান কেটে নেওয়ার পর পরই জমিতে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে ধান কাটার পর জমিতে চাষ দিয়ে ১ সপ্তাহ রৌদ্রে শুকানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে জমি চাষ করার পর চুন প্রয়োগ করতে হবে।

খ) সার প্রয়োগ ঃ

চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পরে প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি হারে কম্পোস্ট সার প্রকল্প এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে। বৃষ্টি হলে অথবা স্লুইস গেইট দিয়ে পানি ঢুকানোর পরে শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম হারে টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে টিএসপি সহজে গলে না। টিএসপি আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রেখে ইউরিয়ার সাথে মিশিয়ে তরল করে সমগ্র এলাকায় প্রয়োগ করতে হবে।

গ) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ঃ

পোনা মজুদের পূর্বে প্লাবন ভুমিতে পোনার উপযোগী খাদ্য তৈরি করে নিতে হবে। এ জন্য মজুদের পূর্বে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। প্লাবনভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য মজুদ থাকলে পানির রং বাদামী, সবুজ বা হালকা বাদামী হয়। তাছাড়া হাত, গ্লাস ও সেকি ডিস্ক এর সাহায্যে প্রাকৃতিক খাদ্যেও প্রাচুর্যতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ঘ) পোনা মজুদ ঃ

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মজুদকৃত পোনার গুনগত মান, আকার ও সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের সময়কাল মাত্র ৪-৬ মাস বিধায় পোনার আকার ৫-৬ ইঞ্চি বা এর চেয়ে বড় হতে হবে এবং তা মান সম্মত হতে হবে। সরপুঁটির পোনা ৩ ইঞ্চি হলে ভাল। প্রতি শতকে ৫০-৬০ টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে যার বিস্তারিত নীচের সরণিতে প্রদান করা হলো:-

প্রজাতি	পোনার আকার (ইঞ্চি)	পোনা মজুদ (সংখ্যা/শতক)
সিলভার কার্প	৫-৬	১৫-১৬
কাতলা	৫-৬	৩-৫
রুই	৫-৬	৫-৬
মৃগেল	৫-৬	৩-৫
কমনকার্প	৪-৫	৫-৭
সরপুঁটি	২-৩	১৫-১৬
গ্রাসকার্প	৫-৬	৪-৫
	মোট	৫০-৬০

ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোন সময়ে প্লাবনভূমিতে মাছের পোনা মজুদ করা যায়। তবে সকাল অথবা বিকালে পোনা মজুদ করাই উত্তম। দুপুরের রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় বিশেষত নিম্নচাপের সময় মাছের পোনা মজুদ করা উচিত নয়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

আমাদের দেশের প্লাবনভূমিগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকে। তদুপরি স্বল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়ার জন্য পরিমাণমত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন। খাবারগুলো হলো-চাউলের কুড়া, গমের ভুষি, সরিষার খৈল, চিটা গুড় অথবা মিল কারখানার তৈরী দানাদার খাবার। দানাদার খাবার সরাসরি প্রয়োগ করা যায়। চাউলের কুড়া, গমের ভুষি, সরিষার খৈল ও চিটা গুড় খাবার হিসাবে ব্যবহার করতে হলে প্রথমে খৈল পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। খৈল পানিতে গলে গেলে তাতে পরিমাণ মত চাউলের কুড়া, গমের ভুষি, ও চিটা গুড় মিশিয়ে মন্ড বানিয়ে তাদ্বারা ছোট ছোট বল বানিয়ে পানিতে প্রয়োগ করতে হবে।প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য মজুদকৃত মাছের মোট দৈহিক ওজনের ৩-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা ভাল। কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে খাদ্যে আমিষের মাত্রা ২৫-৩০% হতে হবে । মাছ সাধারণত দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। সে কারণে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান দু'ভাগ করে এক ভাগ সকাল ১০-১১ টায় এবং অপর ভাগ বিকেল ৩-4 টায় প্রয়োগ করতে হবে । খাদ্যের অপচয় রোধ এবং পানির পরিবেশ ভাল রাখার জন্য খাদ্যদানীতে খাদ্য প্রয়োগ করা অতি উত্তম। তবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিন্মোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:-

- খাদ্যের সঠিক মাত্রা
- খাদ্য প্রয়োগের নির্দিষ্ট সময়
- খাদ্য প্রয়োগের নির্দিষ্ট স্থান

মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ ঃ

জলাশয়ে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন পর্যান্ত রাখার জন্য পোনা মজুদের পর নিয়মিত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ১৫ দিন অন্তর প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২ কেজি কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করতে হবে।

নমুনায়ন ঃ

পোনা মজুদের পর থেকে প্রতি মাসে অন্তত ১ বার করে মাছের নমুনায়ন করতে হবে এবং তদানুযায়ী বর্ধিত খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। এতে মাছের সংখ্যা, বৃদ্ধি, সুষ্থ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় এবং সে প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

আংশিক আহরণ ঃ

মজুদকৃত সকল মাছ সমহারে বৃদ্ধি পায়না বিধায় কিছু মাছ তাড়াতড়ি বড় হযে যায়। তাই মজুদের ৩-৪ মাস পরে যে সব মাছ তুলনামূলকভাবে বেশি বড় হয়ে যায় সেগুলি আহরণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়াকেই আংশিক আহরণ বলা হয়। আংশিক আহরণের পর যতটি মাছ আহরণ করা হয় তৎসহ শতকরা ২৫ টি অতিরিক্ত মাছ পুনরায় মজুদ করতে হবেএবং পুরাপুরি মাছ আহরণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। এতে বিনিয়োগকৃত পুঁজির একটি বড় অংশ আগে বাগেই হাতে চলে আসে, ছোট মাছগুলো পর্যাপ্ত খাবার ও জায়গা পেয়ে দ্রুত বড় হয়ে ওঠে, ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমে যায় এবং রোগবালাইসহ অন্যান্য ঝুঁকি কমে যায়।

শীত পূর্ব চুন প্রয়োগ ঃ

মাছের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো ও ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অক্টোবর মাসে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম হরে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাতে মাছের রোগ জীবানু মারা যাবে ও মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

মাছ আহরণ ও বিক্রয় ঃ

মাছ আহরণের পূর্বে অবশ্যই বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা করতে হবে। কোন কোন বাজারে মাছ বাজারজাত করা হবে, কার মাধ্যমে করা হবে তা আগেই নির্ধারণ করতে হবে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে মাছের বাজার চাহিদা ভাল থাকে বলে এই মাসে মাছ পুরোপুরি আহরণ করে বিক্রয় করলে ভাল মূল্য পাওয়া যেতে পারে।

রেজিস্টার সংরক্ষণ ঃ

সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ টেক সই হয় না। সেজন্য প্রতিটি কার্যক্রমের বিবরণ রেজিষ্টারে রেকর্ড করা ও তা সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন বোধে আলাদা আলাদা রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।

আয় ব্যয়ের হিসাব ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন ঃ

রেজিস্টারে লিখিত তথ্যাদির আলোকে কার্যক্রমের আয় ও ব্যয়ের হিসাব করে লাভ ও ক্ষতি নির্ধারণ করতে হবে। তাছাড়া চলমান কার্যক্রমের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের কার্য-পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে।

অধিবেশন - ১৫

মৎস্য খাতে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১৫.১ ভূমিকা ঃ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে মৎস্য কর্মসূচীর একটি উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রমের ফলে মৎস্য খাত সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব প্রশমনের জন্য যথাযথ কার্যক্রম প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন। তিনটি প্রধান নির্দেশক (indicator) উক্ত প্রভাব পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন (Effect Monitoring and Evaluation = EME) এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক) মৎস্য উৎপাদনে পরিবর্তন

খ) মৎস্য খাত নিয়োজিত মৎস্যজীবি/মৎস্য চাষীদের সংখ্যার পরিবর্তন

গ) মৎস্যজীবি/মৎস্য চাষীদের আয়ের পরিবর্তন

উল্লেখ্য যে উপপ্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অবকাঠামো তৈরীর ফলে সাধারণত মৎস্যবাস (Fish habitat) সংকোচন এবং মৎস্য চলাচল ব্যাহত এবং প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন কমে যায়। পক্ষান্তরে উপ-প্রকল্প এলাকায় নিরাপদে মৎস্যচাষের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হবার ফলে মৎস্য উৎপাদন বেড়ে যায়। প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন কমে যাবার ফলে মৎস্যজীগিনের মাছ ধরার সুযোগ ও আয় কমে যায় কিন্তু মৎস্যচাষের প্রসার লাভের ফলে মৎস্য চাষীদের সংখ্যা এবং তাদের আয় বেড়ে যায়। প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার ফলেও মৎস্য উৎপাদন বেড়ে যায়।

এসব বিবেচনা করে প্রভাব পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়

- বিভিন্ন উৎপাদন এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতিতে বিভিন্ন মৌসুমে মৎস্য উৎপাদনের পরিমান
- মৎস্য খাত নিয়োজিত মৎস্য জীবি ও মৎস্যচাষীদের সংখ্যা ও আয়
- প্রশিক্ষনের প্রভাব (প্রশিক্ষন লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগকারীদের বিবরন)
- উপ প্রকল্প এলাকার মৎস্য উৎপাদনে অংশ গ্রহণকারীদের বিবরন এবং পাবসস এর সম্পৃক্ততা
- উপ প্রকল্প অবস্থিত খাস জমি মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহারের বিবরন

১৫.২ ছক পূরণ করার অনুসরনিকা, ছক - ৫ ঃ

টেবিল ১ ঃ উপ-প্রকল্পের মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি, ব্যবহৃত জলার আয়তন এবং উৎপাদনের পরিমান। ঃ বর্ষা মৌসুমে উৎপাদনের বিবরণ (জুন-নভেম্বর); শুষ্ক মৌসুম (ডিসেম্বর-মে)

২ নং কলামে ঃ জলাভূমির / জলাশয়ের নাম

৩ নং কলামে ঃ সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের মোট আয়তন (একরে) লিখতে হবে।

৪-৭ ঃ প্রাকৃতিক উৎপাদনের কলাম

৪ নং কলামে ঃ প্রাকৃতিক উৎপাদনে ব্যবহৃত জলার আয়তন লিখবেন।

৫ নং কলামে উৎপাদিত মাছের পরিমান

৬ নং কলামে উৎপাদিত চিংড়ির পরিমান

৭ নং কলামে উৎপাদিত মোট মাছ ও চিংড়ির পরিমান

এভাবে ৮-১১ কলামে 'মজুদভিত্তিক উৎপাদন' এর বিবরণ লিখুন।

ছক-৫ : মৎস্য খাত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

উপ-প্রকল্পের নম্বর ও নাম ঃ	উপজেলাঃ	জেলাঃ

টেবিল ১ : উপ প্রকল্পের মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি, ব্যবহৃত জলা এবং উৎপাদনের বিবরণ

বর্ষামৌসুম (জুন-নভেম্বর) / শুস্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর- মে)

(মাসিক মৎস্য উৎপাদন প্রতিবেদন থেকে নেয়া যাবে)

ক্র.নং	জলাভূমি/জলাশয়	মোট আয়তন (একর)	মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি, * ব্যবহৃত জলার আয়তন এবং উৎপাদনের পরিমান							
			আয়তন (একর)	ক. প্রাকৃতিক উৎপাদন		আয়তন (একর)	খ. মৎস্য চাষ ভিত্তিক উৎপাদন		মোট উৎপাদন	
				মাছ	পোনা		মাছ	পোন	মাছ	পোনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ধান ক্ষেত / নীচুভূমি									
২	বিল									
৩	খাল									
৪	হাওড়									
৫	পুকুর দীঘি, ডোবা									
মোট										

* মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতি ঃ ক) প্রাকৃতিক উৎপাদন ঃ কোন পোনা মজুদ না করে শুধু প্রাকৃতিক পোনা দ্বারা বিনা ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক জলা থেকে আহরিত মৎস্য উৎপাদন।

খ) চাষ ভিত্তিক উৎপাদন ঃ চাষ ব্যবস্থাপনা দ্বারা উৎপাদন।

টেবিল ২ ঃ মৎস্য জীবি ও মৎস্যচাষীদের বিবরণ (ডিসেম্বর মাসের সংখ্যা)

ক্রমিক নং	মৎস্য পেশায় নিয়োজিত গ্রুপ *	সংখ্যা		মৎস্যখাত থেকে বার্ষিক মাথা পিছু আয় (টাকা)	বার্ষিক আয় গত বছরের তুলনায় কম/বেশী	আয় পরিবর্তনের কারণ **
		গতবছর	বর্তমান			
১.	প্রকৃত (Full time Fisher)					
২.	খন্ডকালীন মৎস্যজীবি (Part time Fisher)					
৩.	প্রকৃত মৎস্য চাষী (Full time fish farmer)					
৪.	খন্ডকালীন মৎস্যচাষী (Part time fish farmer)					
৫.	নারী					
৬.	মৎস্য ব্যবসায়ী					
	মোট					

* প্রকৃত মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী ঃ জীবিকা নির্বাহের জন্য শুধু মাছ ধরা মৎস্য চাষই যাদের একমাত্র পেশা এবং যাদের কার্যসময়ের অধিকাংশই মাছ ধরা মৎস্য চাষের কাজে ব্যয় হয়।

খন্ডকালীন মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী ঃ যারা বছরের আংশিক সময় মাছ ধরা / চাষ পেশায় নিয়োজিত হন অথবা একই সময় মাছ ধরা / চাষ ছাড়াও অন্য পেশায় নিয়োজিত হন।

** বার্ষিক আয় বাড়া -কমার কারণ লিখুন (জেলেদের উৎপাদন বেড়ে থাকলে তার কারণ লিখুন)।

টেবিল ৩ ঃ উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদনে অংশগ্রহণকারীদের বিবরণ

মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারী	বিনিয়োগের পরিমান (টাকা)	উৎপাদনের ব্যবহৃত জলার আয়তন (একর)	উৎপাদনের পরিমান (টন)	মন্তব্য (আয়)
১	২	৩	৪	৫
পাবসস				
পাবসস অনুমোদিত *				
অন্যান্য				

* পাবসসের অনুমতি / অনুমোদন ক্রমে বা পাবসস থেকে লীজ নিয়ে বা পাবসসের সাথে বিশেষ কোন চুক্তির ভিত্তিতে বা পাবসসের সহায়তায় কোন ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত।

পরিশিষ্ট-ক ঃ মৎস্য অধিদপ্তর ও এলজিইডি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক

মৎস্য অধিদপ্তর

ও

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের নানাবিধ অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপক কর্মকান্ডের পাশাপাশি পল্লী এলাকায় জনগণের আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো, পানি সম্পদ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত। এ ধরনের গ্রামীণ প্রকল্পসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, রাবার ড্যামের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ প্রকল্প, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সরকারের পানি নীতি ও অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার আলোকে পল্লী এলাকায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং পানি সম্পদের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র দূরীকরণ তথা আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় পানি সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণকারী অবকাঠামো তৈরীর ফলে মৎস্য চলাচল ব্যাহত ও মৎস্য চারণ ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে খাল খননের ফলে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রণযোগ্য জলাশয় সমূহে মৎস্য উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সব জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে সহায়তাদানের বিশেষ কর্মসূচী রয়েছে এ প্রকল্পে।

মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এলাকাসমূহে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে, মৎস্য চাষী ও তাদের প্রতিনিধিত্বে গঠিত সংগঠন বা সমিতিকে মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নত মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণসহ মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে ১৯৯৭ সাল থেকে দেশের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ৩৭ টি জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত ২৮০ টি উপ-প্রকল্পে মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর এর উপজেলা ও জেলা কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করণে মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের এই যৌথ ভূমিকা নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়ন অনেক সহজতর করছে। এই সমস্ত মৎস্য কার্যক্রম আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে ১৯৯৭ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর মেয়াদ গত ১২ই এপ্রিল ২০০২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকা সমূহে মৎস্য অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০০২ সাল থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশব্যাপি আরও প্রায় ৩০০টি উপ-প্রকল্প সহ আগামীতে বাস্তবায়িতব্য উপ-প্রকল্প এলাকায় সম্ভাব্য মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজন ও মাছ চাষে আগ্রহী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার লক্ষ্যে পুনরায় এই সমঝোতা স্মারক করা প্রয়োজন।

-৬৭-

সমঝোতা স্মারক

এই সমঝোতা স্মারক ২৪ নভেম্বর, ২০০ ~~অক্টোবর~~ ২০০২ তারিখে নিম্নলিখিত দুটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এবং মধ্যে স্বাক্ষরিত হল:

মৎস্য অধিদপ্তর (পরবর্তীতে "ডিওএফ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের মহা-পরিচালক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব

এবং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (পরবর্তীতে "এলজিইডি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) গ্রামীণ অবকাঠামো এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচ উন্নয়নে নিয়োজিত এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব।

প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে,

যেহেতু

- 'ডিওএফ' এর দায়িত্ব হল, আভ্যন্তরীন ও সামুদ্রিক মাৎস্য সম্পদের যথাযথ ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের পুষ্টির অভাব পুরণ করা, দারিদ্র বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

- এলজিইডি'র দায়িত্ব হল গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি, গ্রোথ সেন্টার বা হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে ও পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরী করা।

- ডিওএফ ও এলজিইডি দেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে যৌথভাবে আগ্রহান্বিত, উভয়ে এলজিইডি কর্তৃক প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজনে সহায়তা করবে।

সেহেতু, উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ডিওএফ ও এলজিইডি পারস্পারিকভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হলো:

১. সহযোগিতা প্রদান

ডিওএফ ও এলজিইডি'র মধ্যে কারিগরী সহযোগিতা কার্যক্রমে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

ক) তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়;
খ) মৎস্য সেক্টরে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কার্যক্রম আয়োজন;
গ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতায় এবং এলজিইডি'র অনুরোধে কারিগরী পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান।

২. শর্ত

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কোন কারণে বাতিল না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উভয় পক্ষই লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবেন। তবে নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ১৮০ দিন পর্যন্ত সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে।

DAM>Fish-MOU.Doc

এলজিইডি'র দায়িত্বসমূহ:

১. এলজিইডি ও এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ডিওএফকে বিধি সম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

২. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করবে।

৩. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প চলাকালিন সময়ে মৎস্য প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপের সকল প্রকার সহায়তা ও ভৌত ব্যবস্থার আয়োজন করবে।

৪. এলজিইডি প্রকল্প চলাকালিন প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের ব্যয় বহন করবে.।

৫. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ডিওএফকে সরবরাহ করবে।

৬. এলজিইডি ডিওএফ'র সাথে ঘনিষ্ট ও কার্যকরী সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য সম্প্রসারন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. ডিওএফ'র দায়িত্বসমূহ

১. ডিওএফ উপজেলা ও জেলা পর্যায় কর্মকর্তা ও কর্মীদের মাধ্যমে এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের আওতায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রিকোনায়সেন্স বা প্রাথমিক জরীপ, প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, মাছ চাষে আগ্রহী সুফলভোগীদের চাহিদা নির্ণয় ও যাচাই, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা নিরুপন, মাছ উৎপাদন উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে এবং ডিওএফ তাদের নিজস্ব সম্প্রসারণ কার্যক্রমে যথাসম্ভব প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

২. ডিওএফ এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকায় মাছ চাষের নিমিত্তে প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প অভ্যন্তরস্থ জলাশয়ে মাছের আঙ্গুলে পোনা মজুদ, অভয়াশ্রম, আতুর পুকুর, হ্যাচারী ও ব্রুড ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করবে।

৩. ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় উপজেলা ও জেলা পর্যায় এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দকে তথা মৎস্যজীবী/ মাছ চাষে আগ্রহী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের সভায় প্রশিক্ষক হিসেবে সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৪. ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সংরক্ষণ আইন, জলাভূমি সম্পদ সংরক্ষণ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্থানীয় মৎস্যজীবি/জেলে সম্প্রদায়সহ সম্পৃক্ত জনগণকে সচেতন করার কাজে সহায়তা করবে।

৫. ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, এলজিইডি ও প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মীদের মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজন ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা পলিসি (Policy) বাস্তবায়ন এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সম্প্রাসরণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাই সম্পর্কে উপজেলা ও জেলা পর্যায় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করবে।

-৩৯-

৬. ডিওএফ প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকায় জলমহাল, পুকুর, বিল ও প্লাবন ভূমিতে দু:স্থ মহিলা ও পুরুষ পাবসস সদস্যদেরকে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য কারিগরী সহযোগীতা প্রদান ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৭. ডিওএফ প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকৃত জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য মাছ উৎপাদন ভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়নে কারিগরী সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৮. ডিওএফ, প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে প্রাকৃতিক মাছ উৎপাদনের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য চাষভিত্তিক মৎস্য কর্মসূচী সম্পর্কে পরামর্শ ও কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করবে।

৯. ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত না করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

১০. ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত প্রকৃত জেলে সনাক্তকরনে ও তাদের তালিকাভূক্ত করনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবে।

১১. ডিওএফ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলী/প্রতিবেদন উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় পেশ/আলোচনা করবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর এবং অনুলিপি এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করবে।

১২. ডিওএফ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশাবলী অনুসরণে পাবসসকে প্রকল্প/উপ-প্রকল্পে মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং মাঠ পর্যায়ের মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদানসহ মৎস্য গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রদান করবে।

১৩. ডিওএফ নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ডিওএফ ও এলজিইডি এই স্মারকের শুরুতে উল্লিখিত তারিখে স্বাক্ষর প্রদানে সম্মত হলো।

মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ)	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
স্বাক্ষর: 28/10/2002	স্বাক্ষর: 28/10/02
(মোঃ নাসিরউদ্দিন আহম্মেদ) মহা-পরিচালক	(মোঃ শহীদুল হাসান) প্রধান প্রকৌশলী

(মোঃ নাসির দ্দিন আহমেদ)
মহাপরিচালক (চঃ দাঃ)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ,
ঢাকা।

LGED Bhaban Agargaon Dhaka

পরিশিষ্ট-খ ঃ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এলজিইডি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ও
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে
সমঝোতা স্মারক

ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের নানাবিধ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকান্ডের পাশাপাশি পল্লী এলাকায় জনগণের আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো সৃষ্টি এবং পানি সম্পদ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত। এ ধরনের গ্রামীণ প্রকল্পসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, রাবার ড্যামের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ প্রকল্প, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সরকারের জাতীয় পানি নীতি ও অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার আলোকে পল্লী এলাকায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং পানি সম্পদের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র দূরীকরণ তথা পল্লীর জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় পানি সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য বান্ধব অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ধরনের পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো তৈরী এবং খাল খননের ফলে সৃষ্ট জলাশয়সমূহে মৎস্য উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় উন্নীত এ সব জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে সহায়তাদানের বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এলাকাসমূহে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য চাষী ও তাদের প্রতিনিধিত্বে গঠিত সংগঠন বা সমিতিকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নত মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণসহ মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে, দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয় সেক্টর প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প এলাকা সমূহে এবং জুলাই ২০০২ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশব্যাপী আরও প্রায় ৩০০টি উপ-প্রকল্পসহ আগামীতে বাস্তবায়িতব্য উপ-প্রকল্প এলাকায় সম্ভাব্য মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মাছ চাষে আগ্রহী উপ-প্রকল্পের সুফলভোগী সমিতি সদসদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অব্যাহত ধারা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক

এই সমঝোতা স্মারক ৭ মার্চ ২০০৪ তারিখে নিম্নলিখিত দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলঃ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ-২২০১ (পরবর্তীতে বিএফআরআই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ডঃ এম.এ. মজিদ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী

এবং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ (পরবর্তীতে এলজিইডি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) অন্যান্যের মধ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ ও সেচ উন্নয়নে নিয়োজিত এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী।

প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে,

যেহেতু

- বিএফআরআই এর দায়িত্ব হল, অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেসব প্রযুক্তি যথাযথ ও সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকার যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান করা।
- এলজিইডি'র দায়িত্ব হল, গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, গ্রোথ সেন্টার বা হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ তথা গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বিএফআরআই ও এলজিইডি দেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যৌথভাবে আগ্রহান্বিত বিধায় এলজিইডি কর্তৃক প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বিএফআরআই মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজনে ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

সেহেতু, বিএফআরআই ও এলজিইডি পারস্পরিকভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হলোঃ

১. সহযোগিতা প্রদান

বিএফআরআই ও এলজিইডি'র মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা কার্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

ক) তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়;

খ) মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহন এবং চাষী সমাবেশের আয়োজন;

গ) মাঠ পর্যায়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি, প্রয়োজনবোধে ট্রায়ালের মাধ্যমে, সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

ঘ) এলজিইডি'র অনুরোধে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ক্ষেত্রে কারিগরি পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান।

২. শর্ত

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কোন কারণে বাতিল না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উভয় পক্ষই লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবে। তবে নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ১৮০ দিন পর্যন্ত সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে।

৩. এলজিইডি'র দায়িত্বসমূহ

১) এলজিইডি ও এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিএফআরআইকে বিধিসম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

২) এলজিইডি তাদের প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করবে।

৩) এলজিইডি তাদের প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প চলাকালীন সময়ে মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানে সকল প্রকার সহায়তা ও ভৌত ব্যবস্থার আয়োজন করবে।

৪) এলজিইডি তাদের প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ ও চাষী সমাবেশ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের ব্যয় বহন করবে।

৫) এলজিইডি তাদের প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিএফআরআইকে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করবে।

৬) বিএফআরআই'র সাথে ঘনিষ্ট ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে এলজিইডি প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষে নতুন নতুন প্রযুক্তির ট্রায়াল ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালু ও তা প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বিএফআরআই'র দায়িত্বসমূহ

১) বিএফআরআই'র আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের আওতায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য উৎপাদন উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা প্রদান, নতুন নতুন প্রযুক্তির ট্রায়ালের ডিজাইন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

২) বিএফআরআই এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকায় সমিতির উপকারভোগী সদস্য কর্তৃক মাছ চাষ নিমিত্ত উক্ত এলাকার অর্ন্তগত জলাশয়ে মাছের পোনা মজুদ, আতুর পুকুর, হ্যাচারী ও ব্রুড ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩) বিএফআরআই এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকায় বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে (In situ-conservation) অভয়াশ্রম স্থাপনসহ সার্বিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

৪) বিএফআরআই'র বিজ্ঞানীবৃন্দ প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় মাছ চাষে আগ্রহী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা/সভায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৫) বিএফআরআই উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিএফআরআই এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও এলজিইডি'র অর্থায়নে প্রকল্পে কর্মরত ও প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পোষ্টার, বুকলেট, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশে বিএফআরআই সহায়তা প্রদান করবে।

৬) এলজিইডি ও বিএফআরআই এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প এলাকায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম বিএফআরআই এর সার্বিক কারিগরি সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

৭) বিএফআরআই তাদের সার্বিক সহযোগিতায় কিছু কিছু প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য তাদের মাধ্যমে প্রযুক্তি প্রদর্শনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৮) এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প এলাকায় আগ্রহী পাবসস সদস্যবৃন্দকে স্বল্প খরচে গলদা চিংড়ির গৃহাংগন হ্যাচারী ও কার্প হ্যাচারী নির্মাণে বিএফআরআই প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

৯) এলজিইডি'র প্রকল্প/উপ-প্রকল্প এলাকায় বিএফআরআই প্রকল্প বাস্তবায়ন পূর্ব মৎস্য সম্পদের জরীপ কাজ সম্পাদন করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে মৎস্য-গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্পসমূহে কি ধরনের মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো প্রয়োজন হবে সে ব্যাপারে বিএফআরআই গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএফআরআই ও এলজিইডি এই স্মারকের শুরুতে উল্লিখিত তারিখে স্বাক্ষর প্রদানে সম্মত হলো।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
স্বাক্ষর: ৭.৮.২০০৮ (ডঃ এম. এ. মজিদ) মহাপরিচালক	স্বাক্ষর: ৭/৮/০৮ (মোঃ শহীদুল হাসান) প্রধান প্রকৌশলী

পরিশিষ্ট-গ :

পরিমান ইউনিট

(Measuring Units)

বিভিন্ন পরিমাপকের রূপান্তর

১ শতাংশ = ৪০ বর্গমিটার

১ বিঘা = ৩৩ শতাংশ = ১,৩২০ বর্গমিটার

১ একর = ১০০ শতাংশ = ৪,০০০ বর্গমিটার

১ হেক্টর = ২.৫ একর (প্রায়) = ১০,০০০ বর্গমিটার

১ পিপিটি (পার্টস পার থাউসেন্ড) = এক সহস্রাংশ = প্রতি লিটারে ১ গ্রাম

১ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) = দশ লক্ষ ভাগে ১ ভাগ = প্রতি লিটারে ১ মিলি গ্রাম

পানিতে পিপিএম হার নির্ধারণ পদ্ধতি

১ টন (পানি) = ১,০০০ লিটার।

১ পিপিএম হার = ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) ভাগে ১ ভাগ = ১০ লক্ষ মিলি লিটারে ১ মিলি লিটার

= ১,০০০ লিটারে ১ মিলি লিটার = ১ টনে ১ মিলি লিটার। অর্থাৎ ১ টন (১ হাজার লিটার) পানিতে ১ গ্রাম দ্রব্য কিংবা ১ মিলি লিটার তরল পদার্থ মিশালে তার হার ১ পিপিএম হবে । এই হারে ১০০ টন পানিতে ৫০০ গ্রাম অথবা ৫০০ মিলি লিটার (১০০× ৫) দ্রব্য মিশালে তার হার ৫ পিপিএম হবে।

পুকুর বা ঘেরে পানির পরিমাণ নির্ণয়

১ টন = ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার = ১ ঘন মিটার

ঘন মিটার = পুকুরের পানির গড় দৈর্ঘ্য (মিটার) × গড় প্রস্থ (মিটার) × পানির গড় উচ্চতা (মিটার)

ফুটকে মিটারে পরিবর্তন করার পদ্ধতি

পানির গড় দৈর্ঘ্য (ফুট) × গড় প্রস্থ (ফুট) × পানির গড় উচ্চতা (ফুট) × ০.০২৮৩